লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৮ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৩ বর্ষ | ১৯তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ২ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ২ রমযান , ১৪৪২ হিজরি | ১৫ শাহাদাত ১৪০০ হি. শা | ১৫ এপ্রিল, ২০২১ ঈসাব্দ

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

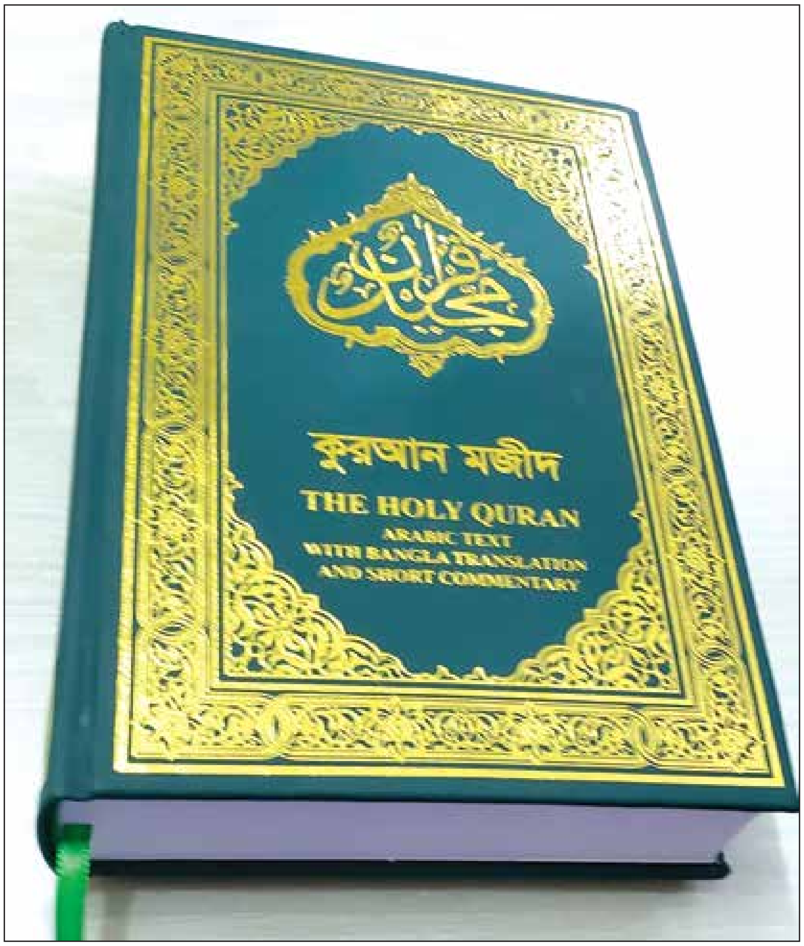

‘পবিত্র কুরআন পুনর্মূদ্রণ করা হয়েছে’

বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ পবিত্র কুরআন স্পষ্টাক্ষরে এবং সহজে বহনযোগ্য আকারে পুনর্মূদ্রণ করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আগ্রহীগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করে নিজ নিজ কপি সংগ্রহ করতে পারেন।

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

সম্পাদকীয়

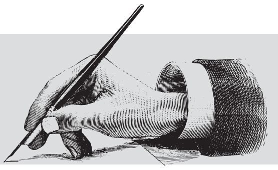

রমযানে কুরআন পাঠে হোক আত্মার প্রশান্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানবজাতির জন্য এক মহান হিদায়াতরূপে এবং হিদায়াতের বিশদ বিবরণ আর সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারীরূপে" *(বাকারা: ১৮৬)*। উক্ত আয়াত রমযানে গভীরভাবে অভিনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠের প্রতি মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একদা এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেন, "কুরআন শরীফ কীভাবে পড়া উচিত?" উত্তরে তিনি (আ.) বলেন: "পবিত্র কুরআন গভীর অভিনিবেশ, মনোযোগ ও মনোনিবেশসহকারে পাঠ করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'কুরআনের এমন অনেক পাঠকারী দেখা যায় যাদেরকে কুরআন অভিসম্পাত করে।' তথা যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করে না, তাকে কুরআন অভিশাপ দেয়। কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন কুরআনের রহমতের আয়াত আসে তখন যেন খোদা তা'লার রহমত যাচনা করা হয় আর যেখানে কুরআনে কোন জাতির শাস্তির বিষয়ে উল্লেখ করা হয় সেখানে খোদা তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা লাভের জন্য তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত তথা তওবা ও ইস্তেগফার করা এবং গভীর অভিনিবেশসহকারে কুরআন পাঠ করা উচিত অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যক।" *(মলফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৭, এডিশন ২০০৩, রাবওয়াহ থেকে প্রকাশিত)*

কুরআনের সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য কী করা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর বাণী থেকে শিখতে পারি। তিনি (আ.) বলেন: "বাহ্যিক জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক ও গতানুগতিক জ্ঞানার্জন তাকওয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ নয়। আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ার জন্য নামায রোযায় নিয়মানুবর্তী হওয়া আবশ্যক নয় আর ঐশী আদেশ ও নিষেধকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখাও আবশ্যক নয় তবে নিজেদের সকল কথা এবং কর্ম আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর অধিনস্ত রাখা আবশ্যক। অনেক সময় দেখা গেছে, জাগতিক জ্ঞানের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জাগতিক জ্ঞান অন্বেষী নাস্তিকতার শিকার হয়ে সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং অধুনাকালে পৃথিবীর সামনে এর জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত বিদ্যমান; যদিও ইউরোপ আমেরিকা জাগতিক জ্ঞানে অনেক উন্নতি করছে আর নিত্যদিন নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করে থাকে কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত লজ্জাকর। লন্ডনের পার্ক আর প্যারিসের হোটেলের বৃত্তান্ত যা পত্রিকায় ছেপেছে তা উল্লেখ করতেও আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু স্বর্গীয় জ্ঞান এবং কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য প্রথম শর্ত হল,' তাকওয়া' বা খোদা ভীতি। এ ক্ষেত্রে 'তওবাতুন নসূ' অর্থাৎ (বিশুদ্ধ চিত্তে) খাঁটি তওবা করার প্রয়োজন রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদার নির্দেশাবলী শিরোধার্য না করবে, তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত না হবে আর তাঁর প্রতাপ ও তাঁর ভয়ে ভীতবিহ্বল হয়ে বিনয়ের সাথে প্রত্যাবর্তন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (মানুষের সম্মুখে) কুরআনের জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হতে পারে না আর আত্মার এসব গুণাবলী এবং বৃত্তির প্রতিপালন কুরআন থেকে সে পেতে পারে না- যা লাভের ফলে আত্মায় এক প্রকার আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ হয়।" *(মলফুযাত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪২৫-৪২৭, ১৯৮৪ এডিশন)*

আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদেরকে সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

সূচিপত্র

১৫ এপ্রিল ২০২১

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ) ৬

কবিতা: খিলাফতে আহমদীয়া ৭
সোহেল মাহমুদ

২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৮
বিষয়বস্তু: ***আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩ মার্চ স্মরণীয়***

২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৬
বিষয়বস্তু: ***হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৭
প্রণেতা: ***হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)***
ভাষান্তর: মওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু

পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয় ২৯
আনোয়ারা বেগম

পর্ব-১১ ৩০
প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর
[৩১ অক্টোবর ২০২০ জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের সাথে]

কবিতা: নতুন ঈদ ৩২
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা ৩৩
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

'এপ্রিল ফুলের' বিষাদময় ইতিহাস অতঃপর আহমদীয়াতের মাধ্যমে স্পেনে ইসলামের গৌরবোজ্জল বিজয় ৩৫
খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

স্মৃতিময় ঘটনাবহুল কিছু কথা ৩৯
আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৪৪
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৪৭

সংবাদ ৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন– পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org**

পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

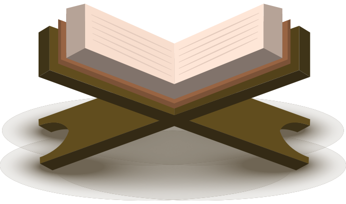

কুরআন শরীফ

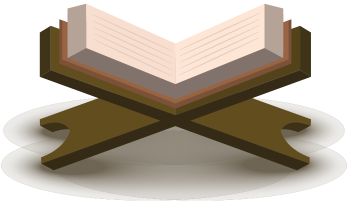

সূরা মারইয়াম-১৯

[চলমান]

يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ
أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ﴿٤٤﴾

৪৪। হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার কাছে সেই জ্ঞান এসে গেছে যা তোমার কাছে আসে নি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٥﴾

৪৫। হে আমার পিতা! তুমি শয়তানের উপাসনা করো না[১৭৭৪]। নিশ্চয় শয়তান রহমান (আল্লাহ্‌র) অবাধ্য[১৭৭৫]।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ
لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٦﴾

৪৬। হে আমার পিতা! আমি অবশ্যই ভয় করছি রহমান (আল্লাহ্‌র) পক্ষ থেকে তোমার উপর কোন আযাব নেমে না আসে এবং (সে সময়) তুমি না আবার শয়তানের বন্ধু (সাব্যস্ত) হয়ে পড়'।

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ
لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٧﴾

৪৭। সে (অর্থাৎ ইবরাহীমের পিতা) বললো, 'তুমি কি আমার উপাস্যদের অবজ্ঞা করছো? হে ইবরাহীম! তুমি বিরত না হলে নিশ্চয় আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো[১৭৭৬]। আর তুমি দীর্ঘকালের জন্য আমাকে একা ছেড়ে দাও'।

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ
بِي حَفِيًّا ﴿٤٨﴾

৪৮। সে (অর্থাৎ ইবরাহীম) বললো, 'তোমার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হোক)। আমি খ.আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি পরম দয়ালু।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّي
عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯। আর (হে পিতা!) গ.আমি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তাদেরকেও ছেড়ে চলে যাব[১৭৭৭]। আর আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করবো। আশা করি আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করে বিফল হবো না।'

১৭৭৪। 'আবাদা' ক্রিয়া পদ 'ইবাদাহ' থেকে উৎপন্ন। 'ইবাদাহ' (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য পদ) কেবল আল্লাহ্ বা প্রতিমার সামনে সিজদা করাই বুঝায় না, অধিকন্তু স্থির মস্তিষ্কে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা না করে কোন ধারণা বা বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অন্ধের মত অনুসরণ করাও বুঝায়। শব্দের শেষোক্ত অর্থ এই আয়াত থেকেই সুস্পষ্ট। কারণ কেউ কোন দিন কাউকে শয়তানের সম্মুখে সিজদাবনত হয়ে তার ইবাদত করতে দেখে নি।

১৭৭৫। তফসীরাধীন আয়াতে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ সূরাটিতেই 'শিরক'কে (মূর্তিপূজা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পুনঃপুন সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ ও নিন্দা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার সিফত 'আর রহমান' অর্থাৎ পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী হওয়ার উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। কারণ শিরক যে কোন রূপে এবং যে কোন প্রকারেই হোক তা আল্লাহ্ তা'লার 'রাহমানিয়ত' অর্থাৎ ঐশী অনন্ত অনুগ্রহরাজির অস্বীকৃতি থেকেই উদ্ভূত বা তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি।

১৭৭৬। 'রাজামাহু' শব্দের অর্থ, সে তাকে প্রস্তরাঘাত করতে করতে হত্যা করলো, সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা বা অভিযোগ করলো, সে তাকে গালি দিল বা অভিশাপ দিল, সে তাকে তাড়িয়ে দিল, সে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করলো (লেইন)।

১৭৭৭। এই আয়াতে মনে হয় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কেনান দেশে হিজরত সম্পর্কে ইশারা করেছেন। তিনি ইরাক ত্যাগ করে কেনান গমন করেন এবং সেখান থেকে মিশরে চলে যান। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর জাতিকে ইরাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তা'লার বাণী পবিত্র কুরআন শরীফ আমাদের সকলেরই নিয়মিত অর্থসহ পাঠ করা উচিত। তবে পবিত্র রমযান মাসে কুরআন পাঠ, অনুধাবন ও চর্চা করার গুরুত্ব অনেক গুণ বেড়ে যায়। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, রমযান মাসে কুরআন শরীফ অবতীর্ণ করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে এ বিষয়ে। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন,

عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

(বুখারী কিতাবুল মানাকিব)

অর্থ: "রসূল করীমে (সা.) বলেন, প্রতি বছর রমযান মাসে জিবরাইল (আ.) আমাকে কুরআন (যতটুকু অবতীর্ণ হয়েছিল) একবার পুনরাবৃত্তি করাতেন, তবে এই বছর তিনি দু'বার আমাকে কুরআন পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন।"

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রতি বছর এই পবিত্র মাসটা কুরআন রপ্ত ও চর্চা করার জন্য কতটা উর্বর একটি সময়। রমযান মাসে আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত অন্তত একবার পুরো কুরআন অর্থসহ পড়ে শেষ করা। হাদীস শরীফে কুরআন নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানো বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

(বুখারী কিতাব ফাযায়িলুল কুরআন)

অর্থ: হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে নিজে কুরআন শেখে ও রপ্ত করে, আর তা অন্যদেরকেও শেখায়।"

এখানে শুধুমাত্র কুরআন শরীফ আক্ষরিক অর্থে শেখানো বা পড়ানো বুঝানো হয় নি, বরং প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনে কুরআনের প্রতিটি শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করা বুঝানো হয়েছে। কুরআনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ করে এর তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করাকে বুঝানো হয়েছে। যদি এমনটি কেউ করতে সক্ষম হয় বা অন্ততঃপক্ষে আন্তরিকভাবে এমনটি করার চেষ্টা করে, তবে সে বড়ই সৌভাগ্যবান, কারণ মহানবী (সা.) স্বয়ং এমন ব্যক্তির কথা উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

কুরআন শরীফের অংশবিশেষ মুখস্ত ও এর শিক্ষাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করা প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

(তিরমিযি শরীফ ফাযায়িলুল কুরআন)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে কুরআনের কোন অংশ ধারণ করে না বা কুরআনের কোন অংশই যার মুখস্ত নেই, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।"

শুধুমাত্র কুরআন পাঠ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং কুরআনের নির্বচিত অংশ মুখস্ত করা, তা নিয়মিত নামাযে পাঠ করা ও কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ে লালন করাটাও আবশ্যক।

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা পাঠ করার পদ্ধতিও মহানবী (সা.) আমাদের বলে দিয়েছেন। তবে এর সাথে সাবধানবাণীও রয়েছে।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

(আবু দাঊদ শরীফ কিতাবুস সালাত)

অর্থ: হযরত সাঈদ বিন আবি সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি নরম সুরে সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

এই হাদীস দ্বারা আমরা কেবল কুরআন পাঠ করার গুরুত্বই বুঝতে পারি তা নয়, বরং কুরআন পাঠ করার নিয়মও আমাদের জন্য মহানবী (সা.) বলে দিয়েছেন। নরম সুরে যতটুকু সম্ভব সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা উচিত। এটি পবিত্র কুরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দাবী।

আসুন আমরা সবাই এই পবিত্র রমযান মাসে বেশি বেশি কুরআন পাঠ করা, কুরআন মুখস্ত করা ও এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নিয়ে গভীর অভিনিবেশ করার অভ্যাস গড়ে তুলি। এই অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হলে তা পরবর্তী এগার মাসে আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

অমৃতবাণী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

“কতিপয় লোক দু’চারদিন নামায পড়ে মনে করে, আমরা বড়ই পুণ্যবান হয়ে গিয়েছি, তাদের চেহারায় অদ্ভুত ধরণের গাম্ভীর্যের সাথে অহংকারও ফুঁটে উঠে। আপনারা কখনো কখনো কতক জুব্বাধারীদের দেখে থাকবেন যে, তসবীহ হাতে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে, তাদের গর্দানেই দম্ভ ও অহংকার দৃশ্যমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই, আহমদীয়া জামা’ত এমন জুব্বাধারীদের থেকে পবিত্র। হজ্জ করে যখন ফেরত আসে, তখন এর এত প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমাই নেই। এমন ব্যক্তিদের রোযাও হয় লোক দেখানোর জন্য আর তাদের হজ্জও হয় লোক দেখানোর খাতিরে। কেবল বড়াই করার জন্যই এইসব করা হয়ে থাকে যে, লোকেরা বলুক– অমুক অত্যন্ত পুণ্যবান মানুষ, রোযাও রাখে আবার হাজীও বটে, বড়ই সৎপরায়ণ ব্যক্তি। লোক দেখানো এইসব কাজ অহংকারের কারণেই হয়ে থাকে বা লোক দেখানোর ইচ্ছা থেকেই এই অহংকার সৃষ্টি হয়ে যায়।”... আমার দৃষ্টিতে পাক-পবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপনের উত্তম পদ্ধতি হলো, মানুষের সর্ব প্রকারের গর্ব ও অহংকার থেকে বিরত থাকা আর এর চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি পাওয়াও সম্ভব নয়। জ্ঞানের দিক থেকেও নয়, বংশ মর্যাদায়ও নয় আর অর্থসম্পদের বেলায়ও নয়। খোদা তা’লা কাউকে দৃষ্টিশক্তি দান করলে সে দেখতে পায় যে, প্রতিটি আলোক রশ্মি যা এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা ঊর্ধ্বলোক থেকেই অবতীর্ণ হয়। প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ সেই ঐশী জ্যোতির মুখাপেক্ষী। চোখেও দেখতে সক্ষম নয় যতক্ষণ না সূর্যের আলো আসে যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অনুরূপভাবে, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যা প্রত্যেক ধরণের অন্ধকারকে বিদূরিত করে আর এর জায়গায় তাক্ওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতি সৃষ্টি করে তা ঊর্ধ্বলোক থেকেই এসে থাকে। আমি সত্য সত্যই বলছি, মানুষের তাক্ওয়া, ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা– এক কথায় সবকিছু ঊর্ধ্বলোক থেকেই অবতীর্ণ হয়। আর এসবই খোদা তা’লার বিশেষ অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে এই সবকিছু বিরাজমান রাখেন আবার তিনি চাইলে এসব মিটিয়ে দেন।

অতএব, সত্যিকার দর্শন হল, মানুষের নিজ সত্তাকে অতি তুচ্ছ ও অর্থহীন জ্ঞান করে বিনয় ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে এক অদ্বিতীয় সত্তার আস্তানায় সিজদাবনত হয়ে খোদা তা’লার আশিস যাচনা করা আর তত্ত্বজ্ঞানের সেই জ্যোতির প্রার্থী হওয়া যা প্রবৃত্তির মোহকে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেয়।”

(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২-২১৩, নবসংস্করণ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (দ্বিতীয় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

সমাপ্তি

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৫৫তম কিস্তি)

বয়আতভুক্ত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক কথা

عزیزاں بے خلوص و صدق نکشایند راہے را
مصفا قطرہ باید کہ تا گوہر شود پیدا

অর্থাৎ, ***"হে প্রিয়গণ! নিষ্ঠা ও সততা ব্যতীত তাঁর পথ উন্মোচিত হয় না যেমন মোতি হওয়ার জন্য স্বচ্ছ পানির ফোঁটা আবশ্যক"***

হে আমার বন্ধুগণ! যারা আমার বয়আতভুক্ত হয়েছ! খোদা তা'লা আমাদের সকলকে সেই সব কথা পালন করার সামর্থ্য ও সৌভাগ্য দান করুন যা পালন করায় তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আজ তোমরা স্বল্পসংখ্যায় আছ বলে হেয় দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়েছ। আর এক পরীক্ষার সময় তোমাদের জন্য বিরাজমান, সেই 'সুন্নাতুল্লাহ্' (ঐশী-রীতি) অনুযায়ী যা আবহমানকাল থেকে অব্যাহত, যা চিরকাল থেকে প্রবহমান। চতুর্দিক থেকে চেষ্টা চলবে যাতে তোমরা হোঁচট খাও, বাধাগ্রস্ত হও। সব রকমে তোমরা ত্যাক্ত-বিরক্ত ও নির্যাতনের শিকার হবে। বহু ধরণের (কষ্টদায়ক) কথা তোমাদের শুনতে হবে। প্রত্যেকেই যে তোমাদেরকে মৌখিক ও দৈহিকভাবে কষ্ট দেবে সে মনে করবে, যেন ইসলামের সহায়তা করছে। আর কিছু ঐশী পরীক্ষাও তোমাদের ওপর আপতিত হবে। যাতে করে তোমরা সর্বিকভাবে পরিক্ষীত হও। অতএব তোমরা এখন থেকে শুনে রাখ যে, তোমাদের বিজয়ী ও প্রবল হয়ে পরিণত হওয়ার এ পথ বা উপায় নয় যে, তোমরা শুষ্ক তর্ক-শাস্ত্র কাজে লাগাও কিংবা বিদ্রুপের মোকাবেলায় বিদ্রুপ দ্বারা জবাব দাও অথবা গালির মোকাবেলায় গালি দাও। কেননা তোমরা যদি উল্লিখিত এসব উপায় বা পথই অবলম্বন কর তাহলে তোমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাবে এবং তোমাদের মাঝে কেবল কথা আর কথা বিরাজ করবে– যা খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য। অতএব তোমরা এমনটা করো না যার দরুণ তোমরা নিজেদের ওপর দু'টি লা'নত (অভিশাপ) একত্রিত কর– একটি সৃষ্টজীব মানুষের আর সেই সাথে অপরটি খোদারও।

নিশ্চিৎ মনে রেখো, যদি সঙ্গে খোদা তা'লার লা'নত না থাকে তবে মানুষের লা'নত কোনো বস্তুই নয় (বরং অতি তুচ্ছ)। যদি খোদা তা'লা আমাদের ধ্বংস করে দিতে না চান, তবে আমরা কারও দ্বারা নাস্তা-নাবুদ হতে পারি না। কিন্তু তিনিই যদি আমাদের শত্রু হয়ে যান তাহলে অন্য কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে পারে না। আমরা কি করে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং কীভাবে তিনি আমাদের সাথে এবং আমাদের সহায়ক হবেন? তিনি এর উত্তর আমাকে বার বার এটিই দিয়েছেন যে, তাক্ওয়া দ্বারা। অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! আপনারা সচেষ্ট হোন যাতে মুত্তাকি হতে পারেন। 'আমল' বা কর্ম ছাড়া সব কথাই বৃথা এবং 'ইখলাস' বা নিষ্ঠা ছাড়া কোন কর্ম (আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে) গ্রহণযোগ্য নয়।

অতএব, তাক্ওয়া এটিই যে, উল্লিখিত এই সব রকম ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করে খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হও এবং পরহেযগারীর সূক্ষ্ম পথসমূহের দিকে সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়ে বিনয়, পবিত্রতা ও নিষ্ঠা (ইখলাস) সৃষ্টি কর এবং সত্যিকার অর্থে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 'হালীম'– ধৈর্যশীল ও গাম্ভীর্যশালী ও 'সালীম'– সরল ও সুষ্ঠু এবং 'গরীব' অর্থাৎ, নিরহংকার ও বিনয়ী হয়ে যাও। বস্তুত সর্বাগ্রে মানব-হৃদয়ে ন্যায় বা অন্যায় দানা বাঁধে। তোমার অন্তর যদি নির্দোষ ও অন্যায় মুক্ত হয়, তবে তোমার জিহ্বা, চোখ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নির্দোষ ও অন্যায় মুক্ত থাকবে। নূর ও আঁধার প্রথমে অন্তরেই সৃষ্টি হয়। এরপর ক্রমশঃ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, নিজেদের অন্তর সর্বক্ষণ নিরীক্ষণ কর। যেমন, যারা পান খায় তারা মুখে পান নাড়াতে থাকে এবং অকেজো অংশ কেটে কেটে বাইরে ফেলে দেয়। তদ্রুপ তোমরাও নিজেদের যেসব গোপন ইচ্ছা, ধ্যান-ধারণা, গোপন অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাকে অকেজো বলে খুঁজে পাও, সেগুলি কেটে হৃদয় থেকে বের করে ফেলে দাও। যাতে এমন না হয় যে, সেগুলো তোমাদের গোটা হৃদয়পটকে কলুষিত করে দেয়। ফলে তোমরা কর্তিত হও।

অতঃপর চেষ্টা কর আর সেই সাথে খোদা তা'লার কাছে শক্তি-সামর্থ প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পবিত্র ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কেননা, যে-কথা তোমাদের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে অন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে তা তোমাদেরকে কোনো মর্তবা বা মার্গে পৌঁছাতে পারে না। খোদা তা'লার মাহাত্ম্য ও মহিমা নিজেদের অন্তরস্থ ও হৃদয়পটে প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর মহত্ব নিজেদের দৃষ্টির সামনে রাখ।

স্মরণ রেখো, কুরআন করীমে প্রায় পাঁচ শ' আদেশ বিদ্যমান। তিনি তোমাদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তোমাদের শক্তি-সামার্থ্য, তোমাদের প্রত্যেক অবস্থা ও বাহ্যাবয়ের, প্রত্যেক অনুধাবন ক্ষমতা, প্রত্যেক বয়স, স্বভাব-চরিত্রের ধরণ ও মাত্রা, ঐশী পথে পদাচারনার মার্গ, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মর্যাদা বা পরিধি অনুযায়ী তোমাদের জন্য এক নূরানী (জ্যোতির্ময়) আমন্ত্রণ বা ভোজের আয়োজন করেছেন। এটি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ কর এবং যত রকম খাবার তোমাদের জন্য তৈরী করেছেন এই সব রকম খাবার খাও এবং এগুলোর উপকারিতা ও পুষ্টি আহরণ কর। যে-ব্যক্তি এ সকল আদেশ-নির্দেশের একটিও পাশ কাটায় বা এড়িয়ে যায়– আমি সত্যসত্য বলছি, সে বিচার দিবসে জবাবদিহির সম্মূখীন হবে।

যদি 'নাজাত' (বা পরিত্রাণ) কামনা কর, তাহলে 'দ্বীনুল-আজায়েয' অবলম্বন কর (অর্থাৎ বিনা ওজর-আপত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব অনুশাসন মেনে চলা ও পালন করার রীতি-নীতি অবলম্বন কর) এবং অতি বিনয়ের সাথে কুরআন করীমের জোয়াল কাঁধে তুলে নাও। নচেৎ, দুষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং অবাধ্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু যে সবিনয়ে বিনত হয় সে (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পাবে। জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের শর্তারোপে খোদা তা'লার ইবাদত করবে না। কেননা এর নিম্নতর ধারণার বশবর্তিতার দরুণ গহ্বর অবধারিত। বরং কেবল এজন্যই তাঁর ইবাদত-উপাসনা করবে যে, ইবাদত হল তোমাদের ওপর ন্যাস্ত সৃষ্টিকর্তার একটি অবধারিত অধিকার। ইবাদত তোমাদের জীবনসর্বস্ব হওয়া উচিত এবং তোমাদের পুণ্যকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদ ও প্রকৃত হিতসাধনকারী আল্লাহ্ তা'লা যেন রাজি হয়ে যান। কেননা, এর চেয়ে নিম্নতর ধারণা হল হোঁচটের কারণ। খোদা তা'লা এক বিরাট সম্পদ। তাঁকে লাভ করার উদ্দেশ্যে বিপদাপদাবলী বরণে প্রস্তুত হয়ে যাও। তিনি পরম কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত। তাঁকে লাভ করতে প্রাণ উৎসর্গ কর। হে প্রিয়গণ! তাঁর আদেশাবলীকে অবহেলার চোখে দেখো না। বর্তমান কালের দর্শনের বিষক্রিয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে। এক শিশুর মত হয়ে তাঁর নির্দেশাবলীর ছত্রচ্ছায় চল। নামায পড়। নামায পড়। এটি যে সকল সৌভাগ্য লাভের চাবিকাঠি। তুমি যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন যেন এমন না হয় যে, তুমি একটা প্রথা পালন করছো। বরং নামাযের পূর্বে তুমি যেমন বাহ্যিক অজু করে থাক তদ্রূপ এক অভ্যন্তরীণ অযুও কর এবং নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছুর ধারণা ধুয়ে ফেল। উক্ত উভয় প্রকার অযুসহ (সবিশেষ মনোনিবেশে) নামাযে দাঁড়াও এবং নামাযের মধ্যে কেঁদে-কেঁদে দোয়া কর এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রন্দন করা নিজেদের অভ্যাসে পরিণত কর, যাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করেন।

সত্যবাদিতা অবলম্বন কর, সত্য-নিষ্ঠা অবলম্বন কর। তিনি যে দেখছেন, কিরূপ তোমাদের অন্তর। মানুষ কি তাঁকেও ধোঁকা দিতে পারে!? তাঁর সামনেও কি প্রতারণা করে পার পাওয়া যায়?! অত্যন্ত দুর্ভাগা মানুষই তার পাপাচারকে এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যেন খোদার কোন অস্তিত্বই নেই। তখন সে শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খোদা তা'লা তাকে আর অবকাশ দেন না।

হে প্রিয়গণ! এ জগতের তর্ক-শাস্ত্র এক 'শয়তান'স্বরূপ। আর এ দুনিয়ার নিছক দর্শন এক 'ইবলিশ' বিশেষ। যা ঈমানী জ্যোতিকে স্তিমিত করে ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করে এবং প্রায় নাস্তিক্যে উপনিত করে। অতএব, এথেকে নিজেদের রক্ষা কর এবং নিজেদের সেই হৃদয় গড়ে তুল যা নিরহংকার ও বিনয়ী। অতএব বিনা অযুহাতে সমস্ত হুকুম মান্যকারী হয়ে যাও, যেভাবে শিশু তার মায়ের কথা মান্য করে।... *(চলবে)*

ভাষান্তর:
মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অব.)

কবিতা

খিলাফতে আহমদীয়া

সোহেল মাহমুদ

অমানিশা ভেঙে ধরণীর বুকে
দেখালো আলোর পথ।
নূরানী নবীর নূরে ঝলমল
আহমদীয়া খেলাফত।

ভুলে জাতিভেদ, শান্তির বাণী
ছড়াবো বিশ্বময়।
শ্রেষ্ঠ নবীর সেরা উম্মত
আমাদের পরিচয়।

তরবারি নয়, নয় বিদ্বেষ
প্রণয়রে জাগরণে,
আমরা ছুটেছি, ছুটে চলবোই
খোদার অন্বেষণে।

তোমরা যারা ক্রোধের আগুন
মগজে রেখেছো ভরে,
আমরা সেখানে আবে জমজম
ঢেলে দেই ঘরে ঘরে।

সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের
হাতে রাখি প্রিয় হাত।
গুছাতেই হবে অন্ধকারের
বিষাক্ত কালো রাত।

চৌদ্দশত বছরের দ্বীপ
নিভে যায় তাঁর নাম।
যুগ-খলীফার স্বর্গীয় হাতে
জেগে উঠে ইসলাম।

চোখের পাতায় আর কত ঘুম
আর কত শুয়ে রবে?
ডাকছে বেলাল, আসছে প্রভাত
জেগে উঠতেই হবে ॥

*****

২৬ মার্চ, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়বস্তু:

আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩ মার্চ স্মরণীয়

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

(সূরা আল্ জুমুআ: ৩)

অর্থাৎ, তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পবিত্র করে আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়, যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(সূরা আল্ জুমুআ: ৪)

আর তাদের মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও তাকে আবির্ভূত করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

দু'তিন দিন পূর্বে ২৩ মার্চের দিন গত হয়েছে। এদিন জামা'তের ভিত্তি রচিত হয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণ (আরম্ভ) করেন; এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীয়া জামা'তে এই দিবসটি স্মরণীয়। কাজেই, প্রতিবছর এ দিনটি আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানোর

একটি উপলক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা। আমরা যারা তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি, আমাদেরকেও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে এতে অংশীদার হতে হবে, খোদা তা'লার সাথে বিভ্রান্ত মানবতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি বান্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। একথা স্পষ্ট যে, এর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের আত্মসংশোধন করতে হবে।

যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য এবং ইতিপূর্বে কুরআনে উল্লিখিত ও মহানবী (সা.)-কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে- তার উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্পর্কেও উল্লেখ করব যা তিনি (আ.) বলে গেছেন, যে পবিত্র পরিবর্তন সাহাবীদের জীবনে এসেছিল। এছাড়া তিনি (আ.) সেসব দুঃখ-কষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা সাহাবীদের ভোগ করতে হয়েছে আর বর্তমানে জামা'তের সদস্যরাও এর সম্মুখীন। অতএব, আমাদের সর্বদা এই বিষয়গুলোকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, যেন আমরা জামা'ত হিসাবে অধঃপতিত হওয়ার পরিবর্তে উন্নতি করতে সক্ষম হই।

তিনি (আ.) তাঁর আবির্ভাব ও সত্যতা সম্পর্কে খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা প্রদান করেছেন, যা নিশ্চিতরূপে আমাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে। আমরা যদি এ বিষয়গুলো চর্চা করতে থাকি এবং সর্বদা সামনে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই এগুলো আমাদের ঈমানে উন্নতির কারণ হতে থাকবে আর আমাদেরকে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকবে।

যাহোক, আমি যেমনটি বলেছি, সে অনুসারে কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি, যেগুলো (আমাদের) নিজেদের জন্যও (গুরুত্বপূর্ণ) আর অন্যদের জন্যও, যাদের তিনি সত্যের বাণী পৌঁছাচ্ছেন এবং যা তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার বিষয়টিকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করছে। আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি, এর ব্যাখ্যায় এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

এই আয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি (স্বীয়) রসূলকে এমন সময়ে প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে রিক্তহস্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান, যার মাধ্যমে মানবজীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং মানব প্রকৃতি জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে, তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর মানুষ ভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ এবং তাঁর সীরাতে মুস্তাকিম তথা সোজাসরল পথ থেকে তারা যোজন যোজন দূরে ছিটকে পড়েছিল। ফলে, এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উম্মী (নিরক্ষর) রসূলকে প্রেরণ করেছেন। আর সেই রসূল তাদের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের পরিপূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং মো'জেযার মাধ্যমে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করেছেন আর খোদা দর্শনের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আরেকটি জামা'ত আছে যা শেষযুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অমানিশা ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দৃঢ়বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবে। তখন খোদা তা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন। অর্থাৎ সাহাবীরা যা কিছু দেখেছেন, তা তাদেরকেও দেখানো হবে। এমনকি তাদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসও সাহাবীদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের রূপ পরিগ্রহ করবে।

অতএব এই হলো সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের লাভ হওয়া উচিত। আমাদের ঈমানী অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আমাদের সেরূপই ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা উচিত যেরূপ (ঈমান ও বিশ্বাস) সাহাবীদের ছিল। সাহাবীদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে, যেমনটি আজকাল আমি খুতবায় তুলে ধরছি, তাদের বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে, তিনি (আ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সালমান ফার্সী-র কাঁধে হাত রেখে বলেন, **'লাও কানাল ঈমানু মুআল্লাকান বিস্‌সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুম্ মিন ফারেস'**। অর্থাৎ যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও অর্থাৎ আকাশেও উঠে যায় তবুও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এখানে তিনি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষযুগে পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সেই যুগে, যে যুগ সম্পর্কে লেখা আছে যে, কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে, সে যুগই মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের যুগ। অর্থাৎ মানুষ ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাবে। আর এই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি তিনিই, যার নাম (রাখা হয়েছে) মসীহ্ মাওউদ। কেননা ক্রুশীয় আক্রমণ, যা প্রতিহত করার জন্য মসীহ্ মাওউদ-এর আগমন হওয়ার কথা, সেই আক্রমণ মূলত ঈমানের ওপরই। আর এই সমস্ত লক্ষণাবলী ক্রুশীয় আক্রমণের যুগকে কেন্দ্র করেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর উক্ত আক্রমণের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। আর সে যুগে, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ ছিল, তাঁর জীবদ্দশায় এসব ভয়াবহ হামলা হচ্ছিল, বরং (তাঁর দাবির) দীর্ঘদিন পর পর্যন্ত এসব ভয়াবহ হামলা অব্যাহত থাকে আর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। তিনি বলেন,

এটি সেই হামলা যেটিকে অন্যভাবে দাজ্জালী হামলা বলা হয়। আসার বা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সেই দাজ্জালী হামলার সময় অনেক নির্বোধ এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিত্যাগ করবে আর বহু লোকের ঈমানী ভালোবাসা উবে যাবে। আর মসীহ্ মাওউদ-এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হবে ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করা, কেননা ঈমানের ওপরই হামলা করা হবে। আর পারস্য বংশীয় ব্যক্তি সম্পর্কে ‘লাও কানাল ঈমানু’ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই পারস্য বংশীয় ব্যক্তি ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই আসবেন। অতএব যেখানে মসীহ্ মাওউদ এবং পারস্য বংশীয় ব্যক্তির যুগ এক ও অভিন্ন আর কাজও একই, অর্থাৎ ঈমানকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, তাই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ মাওউদ পারস্য বংশীয় হবেন। আর وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ আয়াত তাঁর জামা’ত সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতের মর্মকথা হলো, চরম ভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী আর মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনাবলী এবং কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী কেবল দু’টো জামা’ত বা দল রয়েছে। প্রথমটি হলো, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণের জামা’ত, যারা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে চরম অমানিশায় নিমজ্জিত ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় তারা মহানবী (সা.)-এর যুগ লাভ করেন এবং স্বচক্ষে অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করেন আর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ (পূর্ণ হতে) দেখেন। একীন বা বিশ্বাস তাদের মাঝে এমন এক বিপ্লব সাধন করে যেন তাদের কেবল আত্মা-ই অবশিষ্ট রয়ে যায়। আর উপরোল্লিখিত আয়াত অনুসারে সাহাবীদের অনুরূপ দ্বিতীয় জামা’তটি হলো, মসীহ্ মওউদের জামা’ত। কেননা এই জামা’তটিও সাহাবীদের মতো মহানবী (সা.)-এর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অমানিশা ও পথভ্রষ্টতার পর হেদায়েত লাভকারী দল। আর آخَرِينَ مِنْهُمْ আয়াতে এই দলকে যে مِنْهُمْ -এর সম্পদে অর্থাৎ সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে– তা এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করছে। তিনি বলেন, বস্তুত এ যুগে এরূপই হয়েছে অর্থাৎ তেরশ’ বছর পর পুনরায় মহানবী (সা.)-এর মু’জেযা সমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে যে, দারকুতনী ও ‘ফাতাওয়া ইবনে হাজর’-এর হাদীস অনুসারে রমজান মাসে ‘কুসূফ’ ও ‘খুসূফ’-এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে এবং হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের দিনগুলোর মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ এমন সময় সংঘটিত হয়েছে যখন ইমাম মাহদী হওয়ার দাবিকারকও বর্তমান ছিল। আর এমন ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি কখনো সংঘটিত হয় নি, কেননা আজ অবধি কোন ব্যক্তি এর উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে প্রমাণ করতে পারে নি। সুতরাং এটি মহানবী (সা.)-এর একটি নিদর্শন ছিল, যা মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ **‘যুস্ সিনীন’** তারকা-ও উদিত হতে দেখেছে- যার প্রকাশিত হওয়া ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে জাভার (আগ্নেয়গিরির) অগ্নিও লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তদ্রূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জব্রত পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন দেশে রেল চলাচল আরম্ভ হওয়া ও উট বেকার হওয়া– এ সবই মহানবী (সা.)–এর নিদর্শন ছিল, যা বর্তমান যুগে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যেমনটি সাহাবীরা (রা.) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ এই শেষ দলকে مِنْهُمْ শব্দে অভিহিত করেছেন, এদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তারাও সাহাবীসদৃশ। একটু ভেবে দেখ! বিগত তেরশ’ বছরে **‘মিনহাজুন নবুয়্যত’**-এর এমন যুগ আর কারা পেয়েছে? বর্তমান যুগ, যাতে আমাদের জামা’ত গঠন করা হয়েছে, অনেক আঙ্গিকেই এই জামা’ত সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন- তারা অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদা তা’লার নিদর্শন এবং নিত্যনতুন সাহায্য-সমর্থনে আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও বিশ্বাসে ধন্য হন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) হয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ভর্ৎসনা ও নানাবিধ মর্মপীড়াদায়ক কটুক্তি, কটাক্ষ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মতো কষ্ট সহ্য করছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) সহ্য করেছেন। তারা খোদা তা’লার প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী আর ঐশী সাহায্য এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষায় (পরিবর্তিত) পূত-পবিত্র জীবন লাভ করেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) লাভ করেছেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করতে হবে, পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীরভাবে অভিনিবেশ করতে হবে আর এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, তাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা নামাযে ক্রন্দন করেন এবং সিজদাগাহ্‌কে অশ্রুসিক্ত করেন, যেভাবে সাহাবীরা ক্রন্দন করতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী ইলহামের মর্যাদায় ধন্য হন, যেমনটি সাহাবীরা (রা.) হতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন রয়েছেন যারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের জামা’তে ব্যয় করেন, যেভাবে সাহাবীরা (রা.) ব্যয় করতেন। তাদের মাঝে এমন বহু মানুষ পাবে যারা মৃত্যুকে স্মরণ করেন; এটিও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তারা কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং প্রকৃত তাক্বওয়ার পথে পদচারণা করেন যেরূপ সাহাবীদের (রা.) জীবনচরিত ছিল। অতএব এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়, যা তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং যা সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তারা খোদা তা'লার দল যাদেরকে খোদা স্বয়ং তত্ত্বাবধান করছেন এবং প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত তাদের হৃদয় পবিত্র করছেন এবং তাদের হৃদয় ঈমানের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন। (অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা উচিত যে, এ বিষয়গুলো আমাদের মাঝেও সৃষ্টি হচ্ছে কি?) আর ঐশী নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছেন যেভাবে সাহাবীদেরকে আকর্ষণ করতেন। মোটকথা এই জামা'তে সে সকল লক্ষণাবলী বিদ্যমান যা آخَرِينَ مِنْهُمْ শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কথা এক দিন পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এরপর তিনি বলেন,

এই যুগ মূলত সেই (প্রতিশ্রুত) যুগ যে যুগে খোদা তা'লা বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করার আর সকল ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে অবশেষে এক ধর্মের মাঝে সবাইকে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর এ যুগ সম্পর্কে, যা এক তরঙ্গের অপর তরঙ্গের ওপর আছড়ে পড়ার যুগ, খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

(সূরা কাহাফ: ১০০)

এই আয়াতকে পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে মিলালে অর্থ দাঁড়ায়, যে যুগে ধর্মজগতে হৈচৈ দেখা দিবে আর এক ধর্ম অন্য ধর্মের ওপর এমনভাবে আছড়ে পড়বে যেভাবে এক ঢেউ অপর ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে এবং একে অপরকে ধ্বংস করতে চাইবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এই বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগে নিজ হাতে, জাগতিক কোন প্রকার উপকরণ ছাড়াই এক নতুন সিলসিলা (জামা'ত) সৃষ্টি করবেন আর এর মাঝে এমন সবাইকে একত্রিত করবেন যারা সামর্থ্য ও সাদৃশ্য রাখে। তখন তারা বুঝবে যে, ধর্ম কী জিনিস আর তখন তাদের মাঝে জীবন এবং প্রকৃত পুণ্যের প্রেরণা ফুৎকার করা হবে আর খোদা তা'লার প্রজ্ঞার অমৃত সুধা তাদেরকে পান করানো হবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী যতদিন পর্যন্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হয়– যা আজ থেকে তেরশ' বছর পূর্বে পবিত্র কুরআন পৃথিবীতে প্রকাশ করেছে। খোদা তা'লা এই শেষ যুগের বিষয়ে, যেখানে সকল জাতিকে একই ধর্মের মাঝে একত্রিত করা হবে, কেবল একটি নিদর্শনই বর্ণনা করেন নি, বরং পবিত্র কুরআনে আরো অনেক নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। সেসব নিদর্শনের মাঝে একটি হলো, সে যুগে নদীসমূহ থেকে (খাল কেটে) অনেক জলধারা বের করা হবে। আরেকটি হলো, ভূমি থেকে সুপ্ত খনিসমূহ উদঘাটন করা হবে, অর্থাৎ খণিজসম্পদের খনি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং জাগতিক অনেক জ্ঞান উন্মোচিত হবে। আরেকটি হলো, এমন এমন উপকরণ সৃষ্টি হবে- যার মাধ্যমে ব্যাপকহারে বইপুস্তক প্রকাশিত হবে। আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে এমন এক বাহন আবিষ্কার হবে- যা উটকে বেকার করে দিবে আর এর মাধ্যমে পারস্পরিক সাক্ষাতের পথ সুগম হয়ে যাবে। আরেকটি হলো, পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সহজসাধ্য হবে আর এবং একে অপরকে খুব সহজে খবরাখবর আদানপ্রদান করতে সক্ষম হবে। (আর বর্তমান যুগে আরো বেশি সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে) আরেকটি হলো, সে দিনগুলোতে আকাশে একই মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। আরেকটি হলো, অনন্তর পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি কোন শহর ও গ্রাম এর বাইরে থাকবে না যা মহামারি কবলিত হবে না। আর পৃথিবীতে মৃত্যুর মিছিল বের হবে এবং পৃথিবী জনমানবশূন্য হয়ে পড়বে। কতক জনপদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের নাম-চিহ্নও থাকবে না আর অনেক জনপদ সাময়িক আযাব ভোগ করবে, এরপর অবশেষে তাদের রক্ষা করা হবে। সে সময়টি খোদা তা'লার কঠিন ক্রোধের সময় হবে। এর কারণ হলো, তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষের জন্য এ যুগে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী মানুষ গ্রহণ করে নি। আর মানবজাতির সংশোধনকল্পে আগমনকারী খোদার নবীকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব নিদর্শন এ যুগে তথা যে যুগে আমরা বসবাস করছি- পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিমানদের জন্য এটি স্পষ্ট ও আলোকিত পথ যে, এমন যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যখন কিনা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ সকল লক্ষণাবলী আমার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, এ সকল নিদর্শন তাঁর (আ.) যুগে পূর্ণ হয়েছে আর এগুলোর কতক আজও পূর্ণ হচ্ছে। এরপর তিনি (আ.) বলেন,

খোদা তা'লা যুগের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও বিপথগামিতায় পরিপূর্ণ দেখে আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও ধর্মসংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। যুগও এরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আমি ঐশী আদেশের অনুবর্তিতায় সাধারণ্যে লিখিত, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাতে থাকলাম যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার পক্ষ হতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যার আগমন করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি, যাতে আমি সেই ঈমান- যা পৃথিবী হতে উঠে গেছে, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং খোদার পক্ষ থেকে শক্তি লাভ করে তারই কৃপার আকর্ষণে জগদ্বাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদাভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারি এবং তাদের বিশ্বাস ও কর্মের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূরীভূত করতে পারি। এরপর যখন কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হলো তখন খোদার ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার কাছে প্রকাশ করা হলো যে, ঐ মসীহ্, যিনি আদি হতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং সেই শেষ মাহদী যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং ভ্রষ্টতার বিস্তারের যুগে সরাসরি খোদার কাছ থেকে হেদায়েত লাভকারী এবং সেই ঐশী খাবারে পূর্ণ খাঞ্চা নবরূপে মানবজাতির কাছে পরিবেশনকারী হিসাবে ঐশী নিয়তিতে নির্ধারিত যার শুভ সংবাদ আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসূলে করীম (সা.) দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সাথে কথপকোথন এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে, এতে সন্দেহ ও

সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ কিলকের ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এ সকল ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এগুলো দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এর নিরবচ্ছিন্নতা, আধিক্য ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে, এইগুলি সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার বাণী, যাঁর কালাম কুরআন শরীফ। এখানে আমি তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম নিচ্ছি না, কেননা তওরাত ও ইঞ্জিল প্রক্ষেপনকারীদের হাতে এতখানি বিকৃতির শিকার যে, এখন এগুলিকে খোদার বাণী বলা যায় না। মোটকথা, খোদার ঐ ওহী যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা এরূপ অকাট্য ও সুনিশ্চিত যে, এর মাধ্যমে আমি আমার খোদাকে লাভ করেছি। সেই ওহী কেবলমাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হাক্কুল ইয়াকিন' (তথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্বাসের) পর্যায়ে পৌঁছে নি, বরং এর প্রতিটি অংশ যখন খোদা তা'লার বাণী কুরআন শরীফের সাথে যাচাই করে দেখা হলো, তখন তা কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হলো। আর এর সত্যায়নের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়েছে। সে দিনগুলোতেই রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত ছিল যে, এই মাহ্দীর যুগে রমজান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হবে। এ দিনগুলোতেই প্লেগ মহামারি পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে এবং পূর্বের নবীগণও এই সংবাদ দিয়েছেন যে, এই দিনগুলিতে মহামারি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন হবে যে, কোন গ্রাম ও শহর এই মহামারি থেকে মুক্ত থাকবে না। বস্তুত এরূপই হয়েছে এবং হচ্ছে। যখন এই দেশে প্লেগের নাম-চিহ্নও ছিল না, খোদা আমাকে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের ২২ বৎসর পূর্বে এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ দিয়েছেন। এরপর নিজ দাবি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

আমিই সেই ব্যক্তি, যে নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। কুরআন, হাদীস, ইঞ্জিল ও অন্যান্য নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার জন্য আকাশে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সকল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী এবং কুরআন শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দেশে অস্বাভাবিকভাবে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সহীহ হাদীস অনুযায়ী হজ্জ পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে সেই নক্ষত্রটি উদিত হয়েছে- যা মসীহ্ ইবনে মরিয়মের যুগে উদিত হয়েছিল। আমিই সেই ব্যক্তি, যার যুগে এ দেশে রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে উটকে অকেজো করে দেয়া হয়েছে আর সে সময় অচিরেই আসছে, বরং তা সন্নিকটে, যখন মক্কা ও মদিনার মাঝেও রেলচলাচল আরম্ভ হয়ে সেসমস্ত উট বেকার হয়ে যাবে। প্রথমে যেখানে সড়কযোগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সেখানেও এখন রেলগাড়ির মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তেরোশ' বছর ধরে যে উট এই কল্যাণমণ্ডিত সফর করত সেসকল উট বেকার হয়ে যাবে। তখন সহীহ্ মুসলিমে বিদ্যমান সেসব উট সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সত্য প্রমাণিত হবে অর্থাৎ **'লা-ইউতরাকান্নাল কিলাসু ফালা ইউসআ আলাইহা'** অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগে উট বেকার হয়ে যাবে এবং উটে চড়ে কেউ সফর করবে না। তেমনিভাবে আমিই সেই ব্যক্তি যার হাতে শত-সহস্র নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন মানুষ জীবিত আছে যে নিদর্শন প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার বিপরীতে জয়যুক্ত হতে পারে? আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! এখন পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক নিদর্শন আমার হাতে প্রকাশিত হয়েছে আর সম্ভবত প্রায় দশ হাজার বা ততোধিক মানুষ মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখেছেন যাতে তিনি আমার সত্যায়ন করেছেন। আর এদেশে প্রখ্যাত যেসব 'আহলে কাশফ' তথা দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞরা ছিলেন, যাদের একেকজনের তিন থেকে চার লক্ষ করে মুরিদ ছিল, এসব প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, এই ব্যক্তি (তথা হযরত মসীহ্ মাওউদ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত। তাদের মধ্যে কতক এমনও ছিলেন যারা আমার আগমনেরও ত্রিশ বছর পূর্বে গত হয়ে গিয়েছেন। তাদের একজন হলেন লুধিয়ানা নিবাসী পুণ্যাত্মা গোলাব শাহ। তিনি জামালপুর নিবাসী মরহুম করীম বখশ সাহেবকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, কাদিয়ানে ঈসা জন্মগ্রহণ করেছেন আর তিনি লুধিয়ানাতে আসবেন। মিয়া করিম বখশ একজন সৎকর্মশীল বয়োবৃদ্ধ একত্ববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি লুধিয়ানায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে এই পুরো ভবিষ্যদ্বাণী আমাকে শুনান। এ কারণে মৌলভীরা তাকে অনেক কষ্ট দেয়, কিন্তু তিনি সেসব নির্যাতনের পরোয়া করেন নি। তিনি আমাকে বলেন, গোলাব শাহ আমাকে বলতেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম জীবিত নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, তাই তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। এই উম্মতের জন্য মির্যা গোলাম আহমদ হলেন ঈসা, যাকে খোদা তা'লা স্বীয় কুদরতে ও প্রজ্ঞায় পূর্ববর্তী ঈসার সদৃশ বানিয়েছেন এবং ঊর্দ্ধলোকে তার নাম ঈসা রেখেছেন। একথা বলে তিনি তার মুরিদ করীম বখশকে বলেন, হে করিম বখশ! সেই ঈসা যখন আবির্ভূত হবেন তখন তুমি মৌলভীদেরকে তার ভয়াবহ বিরোধিতা করতে দেখেবে। মৌলভীরা চরম বিরোধিতা করবে কিন্তু তারা ব্যার্থ ও অকৃতকার্য হবে। আজও মৌলভীরা ব্যর্থ হয়ে চলেছে। তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, সেসব মিথ্যা ব্যাখ্যা (টীকা, পাদটীকা) যা পবিত্র কুরআনে সংযোজন করা হয়েছে তা অপসারণ করে পবিত্র কুরআনের প্রকৃত রূপ বা চেহারা জগদ্বাসীকে দেখানো। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এই পুণ্যবান স্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, তুমি নিশ্চয় এই ঈসাকে দেখার মতো বয়সও প্রাপ্ত হবে, অর্থাৎ তাঁর শিষ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো, খোদার এক নাম গফুর। সুতরাং কেন তিনি (তাঁর দিকে) প্রত্যাবর্তনকারীদের ক্ষমা করবেন না? যেসব ভুল-ভ্রান্তি জাতিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে, সেসব ভুল-ভান্তির মাঝে একটি হলো

জিহাদ সংক্রান্ত ভ্রান্তি। আমি আশ্চর্য হই, আমি যখন বলি (প্রচলিত তরবারির) জিহাদ হারাম, তখন এরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে, অথচ এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, খুনি মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো সংশয়যুক্ত। মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন বাটালভী এ বিষয়ে পুস্তিকা লিখেছেন। এসব হাদীস যে সংশয়যুক্ত, তা তিনি স্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে মিয়া নযীর হোসাইন দেহলভীরও একই মত ছিল। বর্তমানেও কতিপয় আলেম একই কথা বলছে। তারা এগুলোকে মোটেও সঠিক মনে করত না। তাহলে আমাকে কেন মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া হয়? সত্য কথা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আসল কাজই হলো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বন্ধ করে কলম, দোয়া ও খোদানুরাগের মাধ্যমে ইসলামের নাম সমুন্নত করা। অতএব, আজও তার মান্যকারীদের কলম, দোয়া খোদানুরাগের ভিত্তিতে কাজ হলো দায়িত্ব।

তিনি বলেন, আক্ষেপের বিষয় হলো, মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কেননা জাগতিকতার প্রতি এদের যতটা মনোযোগ রয়েছে ধর্মের প্রতি ততটা মনোযোগ নেই। আমাদেরও নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে মানার পর কোথাও আমরা আবার জাগতিকতায় লিপ্ত হওয়ার বিষয়ে সীমাতিক্রম করিনি তো? তিনি বলেন, জাগতিক কলুষ ও নোংরামিতে লিপ্ত থেকে এটি কীভাবে আশা করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে? পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে, لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ
(সূরা ওয়াকেআ: ৮০)
এ কথাও মন দিয়ে শুন, আমার প্রেরিত হবার চূড়ান্ত লক্ষ্য কী? আমার প্রেরিত হবার মৌলিক উদ্দেশ্য কী? আমার আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন করা। এ থেকে এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমি নতুন কোন শরীয়ত শিখানোর জন্য অথবা নতুন বিধি-নিষেধ প্রদানের জন্য এসেছি অথবা নতুন কোন পুস্তক অবতীর্ণ হবে। কখনো না। যদি কোন ব্যক্তি এমন মনে করে তাহলে আমার দৃষ্টিতে সে চরম পথভ্রষ্ট এবং ধর্মহীন। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় শরীয়ত এবং নবুওয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারবে না। কুরআন মজীদ ‘খাতামুল কুতুব’। এখন এতে এক বিন্দু বা বিসর্গও সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। হ্যাঁ এটি সত্য যে, মহানবী (সা.)-এর বরকত ও কল্যাণধারা এবং কুরআন শরীফের শিক্ষা ও হেদায়েতের ফলবহন করা বন্ধ হয়ে যায় নি। এগুলো প্রত্যেক যুগে নিত্যনতুনরূপে বিদ্যমান রয়েছে। আর সেই বরকত ও কল্যাণরাজির প্রমাণ দেয়ার জন্য খোদা তা’লা আমাকে দাঁড় করিয়েছেন। ইসলামের বর্তমান অবস্থা কারো অজানা নয়। সর্বসম্মতভাবে এটি স্বীকৃত যে, মুসলমানরা সকল প্রকারের দুর্বলতা ও অবনতির লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অধঃপতিত হচ্ছে। (আর বর্তমানে অবস্থা আরো শোচনীয় দেখছি।) তাদের মৌখিক দাবি থাকলেও হৃদয় তা থেকে শূন্য। ইসলাম এতিম হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে খোদাতা’লা আমাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের সমর্থন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য। আর তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে প্রেরণ করেছেন। কেননা তিনি বলেছিলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
(সূরা হিজর: ১০)

যদি তখন ইসলামের সাহায্য ও সুরক্ষা করা না হতো তাহলে সাহায্যের সে সময় আর কখন আসতো? এখন এ চতুর্দশ শতাব্দীতে সেই অবস্থাই বিরাজমান যা বদরের সময় হয়েছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ
(সূরা আলে ইমরান: ১২৪)
এ আয়াতেও প্রকৃতপক্ষে একটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত ছিল। অর্থাৎ যখন চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলাম দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়বে তখন আল্লাহ্ তা’লা উক্ত সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর সাহায্য করবেন। সুতরাং তিনি ইসলামের সাহায্য করছেন দেখে তোমরা কেন বিস্মিত হচ্ছো?

এরপর তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নোংরা কর্থাবার্তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমার এ বিষয়ে কোন আক্ষেপ নেই যে, আমার নাম দাজ্জাল ও কাযযাব (মিথ্যাবাদী) রাখা হয় এবং আমার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। কেননা, আমার সাথে সেই ব্যবহার হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যা আমার পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্টদের সাথে হয়েছে; যেন আমিও এ চিরন্তন রীতির অংশীদার হই। আমি সেসব সমস্যা ও বিপদাপদের একাংশও দেখিনি। কিন্তু আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী (সা.) যেসব কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত নবীকুল আলাইহিমুস্ সালামের কারো মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি (সা.) ইসলামের জন্য সেসব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন কলম যা লিখতে এবং মুখ তা বর্ণনা করতে অপারগ। আর এ থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি কত অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী নবী ছিলেন। যদি খোদা তা’লার সাহায্য ও সমর্থন তাঁর (সা.) সাথে না থাকত, তাহলে এ বিপদাবলীর পাহাড় বহন করা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে যেত। আর যদি অন্য কোন নবী হতো, তাহলে সে-ও ব্যর্থ হতো। কিন্তু যেই ইসলামকে এমন সব সমস্যা ও দুঃখকষ্ট সহ্য করে তিনি পৃথিবীতে প্রচার করেছিলেন; আজ সেটির যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা বলার ভাষা আমার নেই। মুসলমানরা ইসলামকে কতই না শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে। অথচ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ধর্মের সংস্কারের জন্য আগমনকারীকে তারা মানতে প্রস্তুত নয়।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

আমি আমার রচনাবলীর মাধ্যমে এমন নিখুঁত পন্থা উপস্থাপন করেছি যা ইসলামকে সফল এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবে। আমার রচনাবলী ইউরোপ এবং আমেরিকায় যায়। খোদা তা’লা এসব জাতিকে যে অন্তর্দৃষ্টি

দিয়েছেন তারা খোদা প্রদত্ত সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিষয়কে বুঝে নিয়েছে। অথচ আমি যখন একজন মুসলমানের সামনে এগুলো উপস্থাপন করি তখন তার মুখে ফেনা উঠে যায়। যেন সে উন্মাদ বা সে হত্যা করতে চায়। বর্তমানে আহমদীদের সাথে বাস্তবে তারা তা-ই করছে। অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

(সূরা হা-মীম আস সাজদা: ৩৫)

[অর্থ: তুমি সেটি দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত করো যা সর্বোত্তম।] এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষ যদি শত্রুও হয় তাহলে নম্রতা এবং উত্তম ব্যবহারের ফলে সে যেন বন্ধু হয়ে যায় এবং কথাগুলো শান্তশিষ্টভাবে শুনে। আমি মহাপরাক্রমশালী খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তিনি ভালো করে জানেন, আমি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক নই। খোদা তা'লার নামে আমার কসম খাওয়া এবং সেসব নিদর্শন, যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি খোদা তা'লার কসম দিয়ে বলছি, এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে-কিনা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার সাহায্য-সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখবেন। এমন মিথ্যাবাদী কাউকে দেখাও, যে-কিনা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে আর এরপরও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করছেন। বর্তমানে বিশ্ববিস্তৃত আহমদীয়া জামা'তের বিস্তার এর স্পষ্ট প্রমাণ নয় কি যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে রয়েছে? তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লার উচিত ছিল তাকে ধ্বংস করে দেয়া। এমন মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেয়াই আল্লাহ্ তা'লার উচিত ছিল। কিন্তু এখানে বিষয়টি এর বিপরীত। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি সত্যবাদী এবং তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, তবুও আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বলা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা আমার বিরুদ্ধে জাতির সৃষ্ট প্রতিটি মিথ্যা মোকদ্দমা ও বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। আর তিনি এমনভাবে আমায় সাহায্য-সমর্থন করছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। কাছে ও দূরে সর্বত্র এই ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। তখন এটি কেবল ভারতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল, (আর তিনি) ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, দ্বীপপুঞ্জে, অস্ট্রেলিয়ায় এবং আরব দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে [তিনি (আ.) বলেন,] আমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, একজন মিথ্যাবাদীর সাথে এমন আচরণ হচ্ছে! তিনি (আ.) আরো বলেন, আমি এটিকে আমার সত্যতার প্রমাণ মনে করি। এটিই হলো আমার সত্যতার প্রমাণ। এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত যদি তোমরা উপস্থাপন করতে পার, যে মিথ্যাবাদী এবং সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছে আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য-সমর্থন করেছেন আর এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাকে জীবিত রেখেছেন এবং তার আকাঙ্ক্ষাসমূহ পূর্ণ করেছেন– তাহলে তাকে দেখাও! তিনি (আ.) আরো বলেন,

এখন উর্দ্ধলোক থেকে যে জ্যোতি এবং কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হচ্ছে সেগুলোকে মুসলমানদের মূল্যায়ন করা উচিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা তিনি যথাসময়ে তাদের হাত ধরেছেন। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই বিপদের সময় তাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু তারা যদি খোদা তা'লার এই নিয়ামতের মূল্যায়ন না করে তবে তিনি তাদের কোন পরোয়া করবেন না। তিনি নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেন, কিন্তু তাদের জন্য শুধু আক্ষেপই রয়ে যাবে। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির সাথে বলছি, আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য ধর্মকে মিটিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত ও শক্তিশালী করার সংকল্প করেছেন। এখন এমন কোন হাত ও শক্তি নেই যা আল্লাহ্‌র এই অভিপ্রায়ের মোকাবিলা করতে পারে। কেননা তিনি فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ *(সূরা বুরূজ: ১৭)*

[অর্থ: আল্লাহ্ যা চান তা-ই করেন।] হে মুসলমানেরা! স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছেন এবং আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। এখন এটিকে শ্রবণ করা বা না করা তোমাদের হাতে। হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন– এটি সত্য কথা। আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, প্রতিশ্রুত যে ব্যক্তির আসার কথা ছিল সে ব্যক্তি আমিই। এটিও সুনিশ্চিত বিষয় যে, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের জীবন নিহিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা আমার অজ্ঞ বিরোধীদেরকে প্রতিদিন-প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত করছেন। আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, তিনি যেভাবে হযরত ইব্রাহীমের সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ করেছেন এবং এরপর ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম এবং সবার শেষে আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর সাথে এমন বাক্যালাপ করেছেন যে, তাঁর প্রতি সবচেয়ে উজ্জ্বল ও পবিত্র ওহী অবতীর্ণ করেছেন আর অনুরূপভাবে তিনি আমাকে তাঁর সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপের সম্মান দান করেছেন। কিন্তু আমার এই মর্যাদা কেবল মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের ফলেই লাভ হয়েছে। আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর আনুগত্য না করতাম তাহলে আমার কর্ম পৃথিবীর তাবৎ পাহাড়সম হলেও কখনোই আমি এই কথোপকথন ও বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কেননা মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতীত অন্য সকল নবুয়্যতের পথ এখন রুদ্ধ। শরীয়তবাহী কোন নবী এখন আর আসতে পারে না তবে শরীয়তবিহীন নবী হতে পারে, কিন্তু শর্ত হলো প্রথমে তাকে উম্মতী হতে হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতীও আর

নবীও। এছাড়া আমার নবুয়্যত, অর্থাৎ খোদার সাথে কথোপকথন ও বাক্যালাপ মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতেরই একটি ছায়া মাত্র এবং আমার নবুয়্যত এটি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বরং নবুয়্যতে মুহাম্মদীয়াই আমার মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। আমি যেহেতু কেবল ছায়া মাত্র এবং উম্মতী, তাই এর মাধ্যমে তাঁর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি। [অর্থাৎ এতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদার কোন হানি ঘটে নি।] আর খোদার সাথে এই কথোপকথন যা আমার সাথে হয়ে থাকে তা সুনিশ্চিৎ ও সন্দেহমুক্ত। আমি যদি এতে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করি তাহলে কাফের হয়ে যাব এবং আমার আখেরাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমার প্রতি যেসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তা নিশ্চিৎ এবং সন্দেহাতীত। এছাড়া সূর্য এবং এর আলো দেখে কেউ যেভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এটি সূর্য আর এটি এর আলো, ঠিক একইভাবে সেই বাণী সম্পর্কেও আমি সন্দেহ পোষণ করতে পারি না যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয় আর এর প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখি যেভাবে আমি খোদার কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি। তিনি (আ.) আরো বলেন,

খোদা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা হলো- খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে আমি যেন তা দূর করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিা করি এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও মিমাংসার ভিত্তি রচনা করি, আর সেই সব ধর্মীয় সত্য যা বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে, সেগুলোকে প্রকাশ করি এবং সেই আধ্যাত্মিকতা, যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়ে গেছে, সেটির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি, আর খোদার শক্তিসমূহ, যা মানুষের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে খোদানুরাগ বা দোয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়, সেটির অবস্থা কেবল কথায় নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও তুলে ধরি। এছাড়া সবচেয়ে বড় বিষয় হলো সেই বিশুদ্ধ ও দ্যুতিময় তৌহীদ, যা সকল প্রকার শিরকের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত আর যা এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটির চারা যেন জাতির মাঝে পুনরায় রোপন করি। এই সবকিছু আমার শক্তিতে হবে না, বরং সেই খোদার শক্তিবলে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা। আমি দেখছি, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ হস্তে আমার তরবিয়ত করে এবং নিজ ওহীর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করে আমার হৃদয়ে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছেন যেন আমি এ ধরনের সংশোধনের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে যাই। অপরদিকে তিনি এমন হৃদয়ও সৃষ্টি করেছেন যারা আমার কথা মানার জন্য সদাপ্রস্তুত। আমি দেখছি যে, যখন থেকে খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় যেসব লোক হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বে আসক্ত ছিল তাদের পণ্ডিতরাই আজ নিজে থেকে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করছে। এখন তো অসংখ্য লোক এমন রয়েছে যারা এসব বিশ্বাস অস্বীকার করে। এছাড়া যে জাতি পিতাপিতামহের যুগ থেকে বিভিন্ন প্রতিমা এবং দেবদেবীর অন্ধভক্ত ছিল, তাদের অনেকেই (এখন) একথা বুঝতে পেরেছে যে, প্রতিমা অন্তঃসারশূণ্য। যদিও এখনও তারা আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কেবল গুটিকতক শব্দকে প্রথাগতভাবে পুঁজি করে বসে আছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শতসহস্র অর্থহীন কুপ্রথা, বিদাত ও শিরকের রশি তাদের গলা থেকে খুলে ফেলে একত্ববাদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আশা করি, কয়েক বছর পরই ঐশী অনুগ্রহ তাদের অনেককেই নিজের এক বিশেষ হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিয়ে সত্য ও পরিপূর্ণ একত্ববাদের এই নিরাপদ আবাসে প্রবেশ করিয়ে দিবে, যার মাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রেম, (খোদা) ভীতি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়। আমার এই আশাবাদ কেবল ধারণাপ্রসূত নয়, বরং খোদার পবিত্র ওহীর মাধ্যমে আমি এই সুসংবাদ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা এ দেশে উক্ত কাজ সম্পাদন করেছে, যেন অচিরেই বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিতে পরিণত করে শান্তি ও সম্প্রীতির যুগ নিয়ে আসেন। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা কোন একদিন এক জাতিতে পরিণত হবে– এই বাতাসের সুবাস প্রত্যেকেই পাচ্ছে।

পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে, তাঁর দাবিসমূহ বুঝতে পারে এবং শিঘ্রই যেন তারা সেই মসীহ্ ও মাহ্‌দীর বয়আত করে যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আমাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা বয়আতের দাবি পূরণের তৌফিক দিন - আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে।

পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য আমি পুনরায় দোয়ার আহ্বান করছি। সেখানে পরিস্থিতি আবার অধঃপতিত হচ্ছে, কিংবা অস্থিরতা চলতেই থাকে। আমরা এটি বলতে পারি না যে, সেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। পাকিস্তানেও নিত্যদিনই কোন না কোন ঘটনা ঘটে যায়। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা ভালো মনে হচ্ছে না। পুনরায় তারা মামলা চালু করতে চায়। পাকিস্তান, আলজেরিয়া এবং সর্বোপরি পৃথিবীর সকল দেশে, যেখানেই কোন আহমদী কষ্টে আছে, এমন প্রত্যেক আহমদীকেই আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখুন। কিন্তু একই সাথে আহমদীদেরকেও এদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে, তারা যেন পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদা তা'লার প্রতি বিনত হয়, নিজেদের ইবাদতসমূহ সঠিকভাবে পালন করে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করে আর তারা যেন নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

০২ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

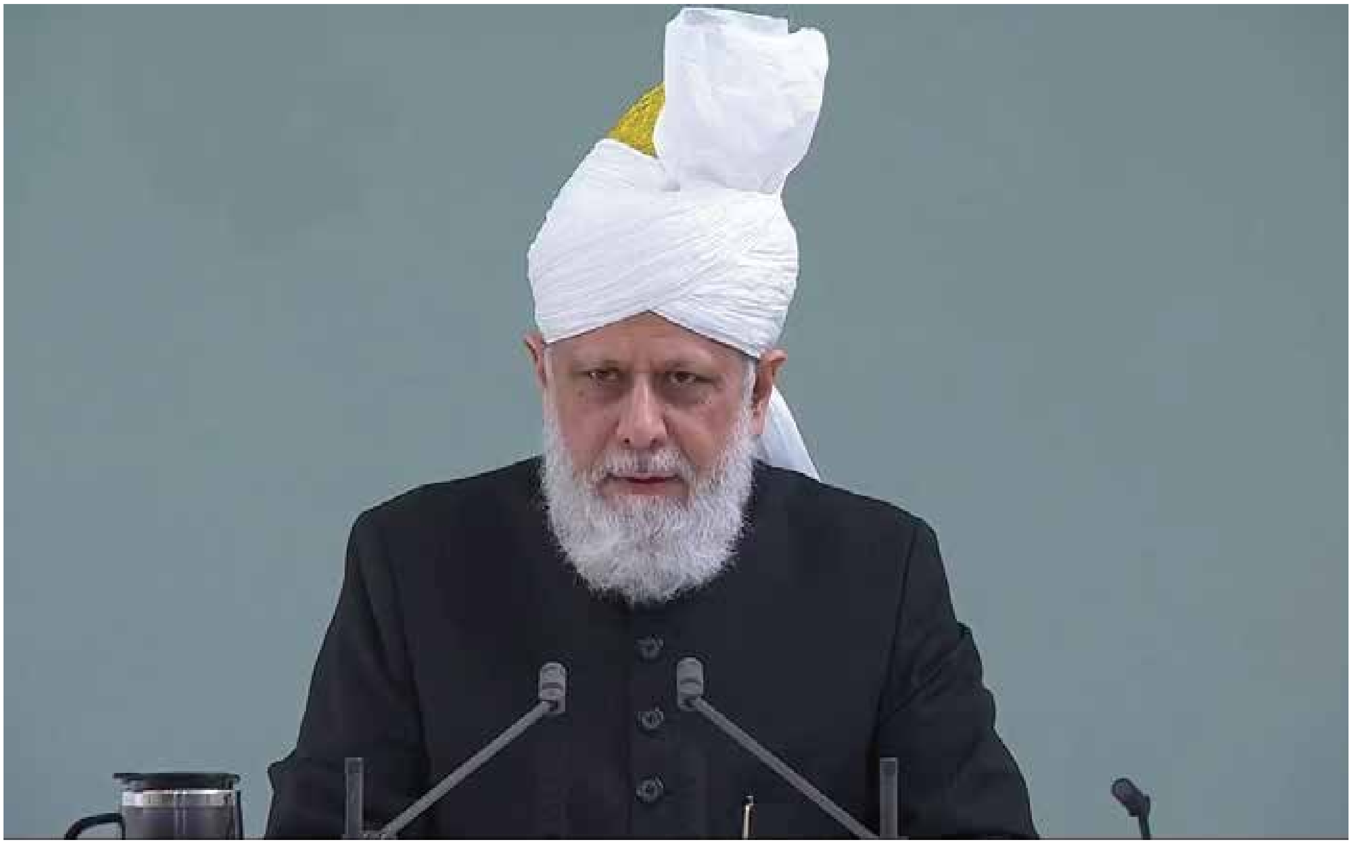

বিষয়বস্তু:

হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবার পূর্বে হযরত উসমান (রা.)-এর স্মৃতিচারণ চলছিল। আজও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)-এর মাঝে পবিত্রতাবোধ ও লজ্জাশীলতার বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক উন্নত মানের। এ সম্পর্কে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী হলেন আবু বকর, আল্লাহ্র ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের সবার চেয়ে দৃঢ় হলেন উমর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান, তাদের মাঝে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তদাতা হলেন আলী বিন আবি তালেব, তাদের সকলের মাঝে উবাই বিন কা'ব সর্বাধিক আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন মুআয বিন জাবাল, তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অবশ্যপালনীয় দায়িত্বাবলীর জ্ঞান রাখেন যায়েদ বিন সাবেত। আর শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন আমীন থাকেন আর এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ্।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী আবু বকর এবং আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ পালন ও বাস্তবায়নে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দৃঢ় উমর এবং তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি লাজ্জাশীল হলেন উসমান।

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) বলেন, আমি কখনোই উদাসীনতা করি নি। আমি কখনো আকাঙ্ক্ষা করি নি, অর্থাৎ খিলাফতের বা অন্য কোন পদের কিংবা মিথ্যা বাসনা পোষণ করি নি।

হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে রেওয়ায়েত করেছেন এবং সেখানে তিনি (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার গৃহে তাঁর রান অথবা গোছার কাপড় সরানো অবস্থায় শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) সে অবস্থাতেই তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি (সা.) কথা বলতে আরম্ভ করেন, এমন সময় হযরত উমর (রা.) (ভেতরে আসার) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও সে অবস্থাতেই অনুমতি প্রদান করেন এবং তিনি (সা.) কথা অব্যাহত রাখেন। তারপর যখন হযরত উসমান (রা.) অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করেন। হাদিসটির বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, আমি এটি বলছি না যে, এসব কিছু একদিনেই ঘটেছে, বিভিন্ন সময়ের ঘটনা হতে পারে। তারা এসে কথাবার্তা বলে চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, যখন হযরত আবু বকর (রা.) এলেন, আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, এরপর যখন উমর এলেন তখনও আপনি তার আসার কারণে তেমন একটা সাবধানতা অবলম্বন করেন নি, কিন্তু যখন উসমান ভেতরে এলেন তখন আপনি বসে পড়েন এবং নিজের কাপড় ঠিক করতে আরম্ভ করেন! প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি সেই ব্যক্তির সম্মান করব না যাকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা করে।

অন্য একস্থানে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করতে গিয়ে একথা লেখা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) যখন নিবেদন করেন, শুধু হযরত উসমানের জন্যই যে আপনি বিশেষ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন– তার কারণ কী? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও পর্দা করে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! ফেরেশতারা উসমানের প্রতি ঠিক সেভাবেই লজ্জাবোধ প্রদর্শন করে যেভাবে তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সামনে লজ্জা করে। উসমান যদি ভেতরে আসতেন আর তখন যদি তুমি আমার পাশে থাকতে তাহলে (তুমি দেখতে) ফিরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার মাথা উঠাতেন না, অর্থাৎ চোখ তুলে তাকাতেন না এবং কোন কথাও বলতেন না, তার মাঝে এতটাই পর্দা বা লাজুকতা রয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'করীম' এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা 'করীম'। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর একটি ঘটনা থেকে জানা যায় যে, 'করীম' বা সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়। (অর্থাৎ) যে ব্যক্তির মাঝে 'করীম' গুণ রয়েছে তার সামনে লজ্জাবোধ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে, মহানবী (সা.) একবার নিজ গৃহে শায়িত ছিলেন এবং তাঁর পায়ের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এসে বসে পড়েন আর এরপর হযরত উমর (রা.)-ও এসে বসে যান, কিন্তু তিনি (সা.) তেমন কোন গুরুত্ব দেন নি। কিছুক্ষণ পরে হযরত উসমান (রা.) দরজায় কড়া নাড়লে তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে উঠে বসেন এবং নিজের পদ যুগল কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন এবং বলেন, উসমান অনেক লজ্জাশীল, তাই তার সামনে পায়ের কোন অংশ খালি রাখতে লজ্জা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসের শব্দগুলো ইতিপূর্বে বর্ণিতও হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে আর তা হলো, একবার মহানবী (সা.) বাড়িতে বসে ছিলেন আর তাঁর পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরানো ছিল। এ অবস্থায়ই হযরত আবু বকর (রা.) ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) সেভাবে শুয়ে থেকেই অনুমতি দিয়ে দেন এবং তার সাথে আলাপচারিতায় রত থাকেন। এরপর উমর (রা.) অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) তাকেও অনুমতি প্রদান করেন এবং সেভাবেই শুয়ে থাকেন; অর্থাৎ শুয়ে ছিলেন বা বসেছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হযরত উসমান (রা.) এলে মহানবী (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের কাপড় টেনে দেয়ার পর তাকে ভেতরে আসার অনুমতি প্রদান করেন। সবাই চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু বকর (রা.) এলেন, উমর (রা.) এলেন, কিন্তু আপনি তাদের আগমনের প্রতি তেমন কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না এবং যেভাবে শায়িত ছিলেন সেভাবেই শুয়ে থাকলেন। কিন্তু উসমান (রা.)-এর আগমনের সাথে সাথে আপনি উঠে বসলেন এবং নিজের কাপড় ঠিক করে নিলেন (কেন)? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, হে আয়েশা! আমি কি তার প্রতি লজ্জা প্রদর্শন করব না যাকে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।

অতএব দেখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর লজ্জাশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, কেননা তিনি

(রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই তিনি (সা.)ও তার প্রতি লজ্জাবোধ প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) মানুষকে লজ্জা পেতেন, তাই মহানবী (সা.)ও তাকে লজ্জা করেছেন। এই ঘটনা উল্লেখ করে তিনি (রা.) বলেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা 'করীম', তাই মানুষের উচিত পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। মানুষের লজ্জা করা উচিত এবং তাঁর কথা মান্য করা উচিত। পাপ করার ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হওয়া ঠিক নয়। এটি ভাবা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত অনুগ্রহ পরায়ণ, তিনি অনুগ্রহ করবেন। আমাদের পাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তিনি বলেন, এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি 'করীম' বা সম্মানিত, তাই বান্দাদেরও উচিত লজ্জাশীলতা অবলম্বন করা এবং পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

(তাঁর) বিনয় ও সরলতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ্ রুমী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজেই রাতের বেলা ওযুর ব্যবস্থা করতেন। তাঁর নিকট নিবেদন করা হয়, আপনি কোন সেবককে নির্দেশ দিলেই তো সে আপনার ওযুর ব্যবস্থা করে দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, রাত তো তাদের জন্য, যাতে তারা বিশ্রাম করতে পারে। অর্থাৎ যারা কাজ করে এমন সেবকদের জন্য রাতে আরাম করার সুযোগ দেয়া উচিত।

আলকামা বিন ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) যখন মিম্বরে ছিলেন তখন হযরত আমর বিন আস (রা.) তাঁর কাছে নিবেদন করেন, হে উসমান! আপনি তো এই উম্মতকে অনেক কঠিন একটি বিষয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। অর্থাৎ উম্মতের উদ্দেশ্যে তিনি (রা.) খুতবা দেন, কিছু কথা বলেন, কিংবা উম্মতকে সতর্ক করেন। অতএব আপনি তওবা করুন এবং তারাও আপনার সাথে তওবা করবে। তিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে ভীষণ ভয় দেখিয়ে ছিলেন, একারণে এক সাহাবী এই নিবেদন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রেক্ষিতে তিনি তখনই তার মুখ ক্বিবলামুখী করেন এবং দুই হাত উঠিয়ে বলেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার সমীপে বিনত হচ্ছি। তখন উপস্থিত লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে এই দোয়া করে। এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভীতি এবং তার (রা.) বিনয়ের বৈশিষ্ট্য যে, কোন প্রকার বিতর্কে না জড়িয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়ার জন্য হাত উঠান। নিজের জন্য দোয়া করেন এবং উম্মতের জন্যও দোয়া করেন।

(তাঁর) উদারতা, বদান্যতা এবং আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াত বিদ্যমান রয়েছে। স্বয়ং হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমার প্রভুর নিকট আমি দশটি জিনিস গোপন রেখেছি। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি হলাম চতুর্থ ব্যক্তি। আমি কখনো আমোদপ্রমোদের উদ্দেশ্যে গান শুনি নি আর মিথ্যা কথাও বলি নি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই আমার লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন জুমুআ অতিবাহিত হয় নি, যে জুমুআয় আমি কোন কৃতদাস মুক্ত করি নি, শুধুমাত্র সে জুমুআ ছাড়া যখন আমার কাছে মুক্ত করার জন্য কোন কৃতদাস না থাকত। এমন অবস্থায় আমি জুমুআর দিনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন কৃতদাস মুক্ত করে দিতাম। অজ্ঞতার যুগে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পরও আমি কখনো ব্যভিচার করি নি।

হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্তকৃতদাস আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায়ও ২০ জন দাসকে মুক্ত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম তখন মানুষ ক্ষুধার কষ্টে জর্জরিত ছিল আর পরিস্থিতি এমন ছিল যে, মুসলমানদের চেহারায় আমি উদ্বিগ্নতা এবং মুনাফেকদের চেহারায় আনন্দের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলাম। এরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করে দিবেন। এ বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল পরম সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি (রা.) শষ্য বোঝাই ১৪টি উট ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে নয়টি উট মহানবী (সা.)-এর সমীপে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এটি দেখে বলেন, এগুলো কী? উত্তরে বলা হলো, হযরত উসমান (রা.) এগুলো আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এতে মহানবী (সা.)-এর চেহারায় খুশি ও আনন্দ ফুটে উঠে আর মুনাফেকদের চেহারায় অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা ছেয়ে যায়। তখন আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) তাঁর দুই হাত এতটা উঠান যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং তিনি হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন। মহানবী (সা.)-কে আমি অন্য কারো জন্য এরূপ দোয়া করতে এর পূর্বে বা পরে কখনোই শুনি নি। আর সেই দোয়াটি ছিল, 'আল্লাহুম্মা আতে উসমানা, আল্লাহুম্মাফআল বেউসমানা'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! উসমানকে অশেষ দান কর, হে আল্লাহ্! উসমানের ওপর তুমি নিজ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ কর।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে মাংস দেখে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কে পাঠিয়েছে। উত্তরে আমি বললাম, হযরত উসমান (রা.) পাঠিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, একথা শোনার পর মহানবী (সা.)-কে আমি উসমান (রা.)-এর জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি।

মুহাম্মদ বিন হেলাল তার দাদির পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ গৃহে অবরুদ্ধ করার পর তার দাদি তাঁর কাছে (প্রায়ই) আসতেন। তিনি বলেন, তার দাদির গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর তার নাম রাখা হয় হেলাল। একদিন হযরত উসমান তাকে (অর্থাৎ তার দাদিকে) দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, সেই রাতে তার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার দাদী বলেন, এতে হযরত উসমান আমার প্রতি পঞ্চাশ দিরহাম ও চাদরের একটি বড় টুকরো প্রেরণ করেন এবং বলেন, এটি তোমার পুত্রের জন্য ভাতা আর এটি হলো তার পরিধানের জন্য কাপড়। তার বয়স যখন এক বছর হবে তখন আমরা তার ভাতা বৃদ্ধি করে একশত দিরহাম করে দিব।

ইবনে সাঈদ বিন ইয়ারবূ বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন দুপুরের পর ঘর থেকে বের হই, তখন আমি নিতান্ত এক শিশু ছিলাম। আমার কাছে একটি পাখি ছিল, যেটিকে আমি মসজিদে উড়াচ্ছিলাম। তখন দেখি সেখানে এক সুদর্শন বুযুর্গ শায়িত আছেন। তার মাথার নীচে ইট বা ইটের একটি টুকরো ছিল; অর্থাৎ বালিশের স্থলে ইট রাখা ছিল। আমি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকি। তিনি নিজের চোখ খুলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে বালক! তুমি কে? আমি তাকে নিজের সম্পর্কে জানালে তিনি নিকটেই শায়িত এক ছেলেকে ডাকেন। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয় নি। তখন তিনি আমাকে বলেন যে, তাকে ডেকে আন। অতএব আমি তাকে ডেকে আনি। সেই বুযুর্গ তাকে কিছু নিয়ে আসার নির্দেশ দেন এবং আমাকে বলেন যে, বসে পড়। অতঃপর সেই ছেলে চলে যায় আর একটি পোশাক ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসে। তিনি আমার জামা খুলিয়ে তার স্থলে আমাকে সেই পোশাক পরিয়ে দেন। আর সেই এক হাজার দিরহাম উক্ত পোশাকের পকেটে রেখে দেন। আমি আমার পিতার কাছে গিয়ে তাকে পুরো ঘটনা অবহিত করি। তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! তোমার কি জানা আছে যে, কে তোমার সাথে এরূপ ব্যবহার করেছে? আমি বললাম, আমার জানা নেই, কেবল এতটুকু বলতে পারি যে, তিনি এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন যিনি মসজিদে শুয়ে ছিলেন আর তার চেয়ে অধিক সুশ্রী আমি আমার জীবনে আর কাউকে দেখি নি। তখন তিনি বলেন, তিনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)।

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, হযরত তালহা হযরত উসমানের সাথে তখন মিলিত হন যখন তিনি মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত তালহা বলেন, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, যা আমার দায়িত্বে রাখা ছিল, সেগুলো এখন হাতে এসেছে। আপনি সেগুলো আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এতে হযরত উসমান তাকে বলেন, আপনার ভালোবাসার কারণে আমি সেগুলো আপনার জন্য হেবা করে দিয়েছি, আমি তা আর ফেরত নিব না। আসমাঈ বলেন, কাতান বিন অউফ হিলালী-কে ইবনে আমের কিরমানের অঞ্চলে গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি চার হাজার মুসলমানের সৈন্য নিয়ে বের হন। পথিমধ্যে একটি উপত্যকা বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হয়, যার কারণে তাদের পথ বন্ধ হয়ে যায় আর কাতান-এর সময়মতো (গন্তব্যস্থলে) পৌঁছতে না পারার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি এই উপত্যকা পার করবে সে এক হাজার দিরহাম পুরস্কার পাবে। এতে মানুষ সাঁতরে উপত্যকা পার হতে থাকে। যখনই কোন ব্যক্তি উপত্যকা পার করত তখন কাতান বলতেন, তাকে তার 'জায়েযা' অর্থাৎ পুরস্কার দিয়ে দাও। এমনকি পুরো বাহিনী উপত্যকা পার করে ফেলে। আর এভাবে তাদের সবাইকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হয়। কিন্তু গভর্ণর ইবনে আমের কাতানকে উক্ত অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং বিষয়টি হযরত উসমান (রা.)-এর সমীপে লিখে পাঠান। এতে হযরত উসমান (রা.) বলেন, উক্ত অর্থ কাতান-কে দিয়ে দাও, কেননা সে তো আল্লাহ্ তা'লার পথে মুসলমানদের সহায়তা করেছে। অতএব উক্ত উপত্যকা পার করার কারণে সেই দিন থেকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদানকৃত অর্থের নাম 'জাওয়ায়েয' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, যা 'জায়েযা' শব্দের বহুবচন। হযরত উসমান একবার অসুস্থ হলে (তাঁর কাছে) কাউকে খলীফা মনোনীত করার অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত ঘটনাকে হিশাম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মারওয়ান বিন হাকাম আমাকে বলেন, যে বছর নাক দিয়ে রক্ত পড়ার রোগ (এপিস টেক্সিস) ছড়িয়ে পড়ে (সে বছর) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-ও মারাত্মকভাবে উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, এমনকি উক্ত অসুস্থতার কারণে তিনি হজ্জে যেতে অপারগ হয়ে পড়েন এবং তিনি ওসীয়্যত লিখিয়ে দেন। তখন কুরাইশদের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দিন। আপনার অবস্থার প্রেক্ষিতে কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এ কথা কি মানুষ বলেছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কাকে খলীফা বানাতে চায়? সেই ব্যক্তি চুপ থাকে। এরই মাঝে আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে, (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় সে ছিল হারেস, এবং বলে, আপনি কাউকে খলীফা মনোনীত করুন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, এ কথা কি লোকজন বলছে? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, খলীফা কে হবে ? সে চুপ থাকে। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সম্ভবত মানুষ যুবায়ের-এর কথা বলছে। সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। হযরত উসমান (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে

আমার প্রাণ আছে! আমি যতদূর জানি, তিনি তাদের মাঝে নিশ্চয়ই সর্বোত্তম এবং মহানবী (সা.)-এর কাছেও তিনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

হযরত উসমান (রা.) ওহী লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ পেয়েছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা মুয্‌যাম্মেল অবতীর্ণ হবার সময় হযরত উসমান (রা.)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। উম্মে কুলসুম বিন সামামাহ্ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললাম, আমরা আপনার নিকট হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে জানতে চাই, কেননা মানুষ তাঁর সম্পর্কে আমাদের কাছে অনেক বেশি জানতে চাইছে। এটি শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার প্রচণ্ড গরমের এক রাতে আমি এই ঘরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-কে দেখেছি যখনকিনা মহানবী (সা.)-এর ওপর হযরত জীবরাঈল (আ.) ওহী অবতীর্ণ করছিলেন। ওহী অবতীর্ণ হবার সময় মহানবী (সা.)-এর ওপর ভীষণ চাপ পড়তো যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

(সূরা আল মুয্‌যাম্মেল: ৫)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো।

মহানবী (সা.)-এর সামনে বসে হযরত উসমান (রা.) লিখে যাচ্ছিলেন আর তিনি (সা.) বলছিলেন, হে উসমান! লিখতে থাক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এমন নৈকট্য কেবল নিতান্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান কোন ব্যক্তিকেই দান করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআন লিখিতভাবে পুস্তকখণ্ডাকারে একত্রিত হয়, যা তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এরপর তা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে ছিল। তারপর সেটি হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে ছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে কুরআনের সেই কপিটি তাঁর কাছে পৌঁছার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি ইরাকবাসীদের সাথে নিয়ে আর্মেনিয়া এবং আযারবাইজান বিজয়ের লক্ষ্যে সিরিয়াবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন আর সেখান থেকে ফিরে হযরত উসমান (রা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। হযরত হুযায়ফা (রা.) সেই এলাকার লোকদের কুরআন পঠনরীতির ভিন্নতার কারণে শঙ্কিত হন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট নিবেদন করেন যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কিতাবের বিষয়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় মতবিরোধ আরম্ভ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মতকে সামলান। এটি শুনে হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট বার্তা প্রেরণ করেন যে, কুরআনের লিখিত পুস্তকখণ্ডগুলো আমার কাছে প্রেরণ করুন যাতে সেগুলোর অনুলিপি তৈরি করতে পারি। এরপর সেগুলো পুনরায় আপনাকে ফেরত দেয়া হবে। অতএব হযরত হাফসা (রা.) সেটি হযরত উসমান (রা.)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। হযরত উসমান (রা.) তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, হযরত সাঈদ বিন আস এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা.)-কে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত উসমান (রা.) শোষোক্ত তিন সাহাবীকে, যারা কুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলেন, বলেন, তোমাদের এবং যায়েদের লিখিত কুরআনের কোন অংশ নিয়ে যদি কখনো মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা সেটি কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করো, কেননা কুরআন করীম কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব সেই সাহাবীরা উক্ত কাজ করেন। অনুলিপি প্রস্তুত হবার পর হযরত উসমান (রা.) মূল পুস্তকখণ্ডগুলো হযরত হাফসা (রা.)-কে ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং নতুন কপিগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এটি ছাড়া অন্যান্য যত অনুলিপি রয়েছে সেগুলো যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। আল্লামা ইবনুত্ তীন বলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনার মধ্যে পার্থক্য হলো, হযরত আবু বকর এই ভয়ে কুরআন সংকলন করেছিলেন যে, কুরআনের হাফেযদের মৃত্যুবরণের কারণে কুরআনের কোন অংশ কোথাও হারিয়ে না যায়, কেননা কুরআন একস্থানে জড়ো করা হয়নি। অতএব তিনি পবিত্র কুরআনকে এর আয়াতের সেই ধারাবাহিকতায় সংকলন করেন যেভাবে মহানবী (সা.) তাদেরকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়েছিলেন। আর হযরত উসমানের কুরআন সংকলনের ঘটনা হলো, যখন পঠনরীতি বা কিরাআতে অনেক বেশি মতবিরোধ হতে থাকে, এখানকার লোকেরা নিজস্ব উচ্চারণ ও ভাষারীতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতে আরম্ভ করে, এমনকি একে অন্যের পঠনরীতি বা কিরাআতকে ভুল আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে, তখন তিনি শঙ্কিত হন যে, কোথাও এই বিষয়টি আবার চরম রূপ পরিগ্রহ না করে। সুতরাং তিনি সেই কপিগুলো, যা হযরত আবু বকর তৈরি করিয়েছিলেন, সূরার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এক পুস্তকাকারে সংকলন করেন এবং শুধু কুরাইশদের ভাষারীতি রাখেন। তিনি এর সপক্ষে এই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, পবিত্র কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যদিও শুরুতে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যান্য ভাষারীতি অনুযায়ীও কুরআন পাঠের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে, এখন আর এরূপ করার প্রয়োজন নেই, তখন তিনি একই ভাষারীতির কিরাআত যথেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত উসমান মানুষকে স্বীয় সংকলিত

কুরআনে ঐক্যবদ্ধ করার কষ্ট কেন করলেন, যখনকিনা তার পূর্বে হযরত আবু বকর উক্ত কাজ সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন? তাহলে এর উত্তর হলো, হযরত উসমান যা করেছিলেন সেটির উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনের সংকলনে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল না। আপনারা কি দেখতে পান না যে, হযরত উসমান উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাকে বলে পাঠান যে, আপনি কুরআনের মূল পুস্তকখণ্ডগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আমরা সেগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করে মূল আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হযরত উসমান এ পদক্ষেপ শুধু এজন্য নিয়েছিলেন যে, কুরআন পড়ার রীতি বা কিরাআত সম্পর্কে মানুষ মতভেদ আরম্ভ করেছিল, কেননা সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং পঠনরীতির বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। সিরিয়া ও ইরাকবাসীদের মধ্যে বিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যা হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সূরা আ'লার আয়াত سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাকে সেই বাণী শিখাব যা তুমি কিয়ামত পর্যন্ত ভুলবে না। বরং এ বাণী সেভাবেই সুরক্ষিত থাকবে যেভাবে এখন রয়েছে। অতএব এ দাবির প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের চরম শত্রুগণও বর্তমানে অকপটে স্বীকার করে যে, কুরআন করীম অবিকল সেই একই রূপ ও অবস্থায় সুরক্ষিত আছে যেই রূপ ও অবস্থায় মহানবী (সা.) এটিকে উপস্থাপন করেছিলেন। নলডিকি, স্প্রিঙ্গার এবং উইলিয়াম মুর, সবাই নিজ নিজ পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে,

অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে আমরা কেবল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এটি বলতে পারি না যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে অবস্থায় উক্ত পুস্তক পেশ করেছিলেন সেই একই রুপে তা পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। শুধুমাত্র কুরআনই এরূপ একটি ধর্মগ্রন্থ যেটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বীয় সাহাবীদেরকে এটি যে অবস্থায় দিয়েছিলেন অবিকল সেই রূপেই তা এখনও বিদ্যমান আছে। এরা যেহেতু এটি বিশ্বাস করে না যে, পবিত্র কুরআন খোদা তা'লা অবতীর্ণ করেছেন, বরং তাদের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং এটি রচনা করেছেন, তাই যদিও তারা একথা বলে না যে, যেরূপে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক সেরূপেই বিদ্যমান আছে, কিন্তু একথা তারা অবশ্যই বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেরূপে এই কিতাব উপস্থাপন করেছিলেন সেরূপেই এ গ্রন্থ এখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। যেমন স্যার উইলিয়াম মুর তার The Qur'an পুস্তকে লিখেন,

এই সকল প্রমাণ হৃদয়কে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত করে যে, সেই কুরআন যা আজ আমরা পাঠ করি, এর প্রতিটি অক্ষর তা-ই যা মহানবী (সা.) মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

এরপর স্যার উইলিয়াম মুর নিজ কিতাব 'লাইফ অব মুহাম্মদ'-এ লিখেন, এখন আমাদের হাতে যে কুরআন আছে, হতে পারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ যুগে এটিকে নিজেই রচনা করেছিলেন আর কোন সময় এর মাঝে নিজেই কতক পরিবর্তনও করে থাকবেন, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি সেই কুরআন যা মুহাম্মদ (সা.) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। একইভাবে তিনি আরো লিখেন, আমরা দৃঢ় ধারণার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, কুরআনে লিপিবদ্ধ প্রত্যেকটি আয়াত সেই মূল অবস্থায় বিদ্যমান এবং এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর অপরিবর্তিত রচনা।

এরপর জার্মান প্রাচ্যবিদ নলডিকি লিখেন, সামান্য লিপিপ্রমাদ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু উসমান জগতের সামনে যে কুরআন উপস্থাপন করেছেন, এর বিষয়বস্তু ঠিক তা-ই আছে যা মুহাম্মদ (সা.) উপস্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ এর বিন্যাস বিস্ময়কর। ইউরোপিয়ান আলেমদের এটি প্রমাণের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, কুরআনে পরবর্তী যুগেও কোন পরিবর্তন এসেছে।

মোটকথা ইউরোপিয়ান লেখকরাও একথা স্বীকার করেছে যে, যতদূর কুরআনের বাহ্যিক সুরক্ষার বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ করার সুযোগ নেই। বরং প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর হুবহু তা-ই যা মুহাম্মদ (সা.) মানুষকে পড়ে শুনিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ হযরত উসমান (রা.)-কে কুরআন সংকলনকারী বলে থাকে। এ কথা ভুল, উসমান কেবল শব্দের সাথে ছন্দের মিল দেখিয়েছেন। অবশ্য, কুরআনের প্রচারক-প্রসারক বললে কিছুটা সঠিক বলে মানা যায়। তাঁর খিলাফতের যুগে ইসলাম দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছিল, তাই তিনি কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া আর বসরা ও কুফা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন। আর একত্রিকরণের বিষয়টি তো আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত বিন্যাস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ই করেছিলেন। আর সেই পছন্দনীয় বিন্যাসই আমাদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে। হ্যাঁ, এটি পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করার দায়িত্ব আমাদের সবার।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে মক্কা, মদিনা, নাজাদ, তায়েফ ও ইয়েমেনের লোকেরা স্ব স্ব অঞ্চলে বসবাস করা আর একে অপরের ভাষা এবং প্রবাদের বিষয়ে অনবহিত হওয়া সত্ত্বেও মদিনা রাজধানী হওয়ার সুবাদে সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মদিনাবাসী শাসক ছিল, যাদের মাঝে একটি বড় অংশ মক্কার মুহাজের ছিল আর স্বয়ং মদীনাবাসীও মক্কাবাসীদের সান্নিধ্যে হিজাযী আরবী শিখে গিয়েছিল। অতএব আইন প্রয়োগ

যেহেতু তাদের মাধ্যমেই হতো, অর্থ-সম্পদও তাদের অধীনেই ছিল তথা রাজত্ব যাদের হাতে ছিল আর মানুষ তাদের পথপানে চেয়ে থাকত, সেসময় তায়েফ, নাজাদ, মক্কা, ইয়েমেন ও অন্যান্য এলাকার অধিকাংশ লোক মদিনায় আসা-যাওয়া করত আর মদিনার মুহাজের ও আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করত এবং ধর্ম শিখতো। এভাবে সকল দেশের মানুষের জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভাষা এক ও অভিন্ন হতে থাকে। এরপর তাদের মাঝ থেকে কতক মদিনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাদের ভাষা অনেকটা হিজাযী হয়ে গিয়েছিল। এরা যখন নিজেদের দেশে ফেরত যেত আর আলেম এবং শিক্ষক হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে তাদের এলাকায় তাদের ফিরে যাবার সুবাদে অবশ্যই প্রভাব পড়তো। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধের কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ হতো আর নেতা যেহেতু বড় বড় সাহাবীরা হতেন, তাদের সাহচর্য এবং তাদের অনুকরণ করার বাসনা ভাষায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিত। অতএব প্রথমদিকে হয়ত মানুষের পবিত্র কুরআনের ভাষা বুঝতে সমস্যা হতো, কিন্তু মদিনা রাজধানী হবার পর যখন সমস্ত আরবের কেন্দ্র হলো ‘মদিনা মুনাওয়ারা’ আর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী বারবার সেখানে আসা আরম্ভ করে, তখন এই ভিন্নতার কোন আশংকা আর রইল না। কেননা ততদিনে সকল জ্ঞানবুদ্ধির মানুষ কুরআনের ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মানুষজন ভালোভাবে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে যেন কেবল হেজাযি কিরাআত পড়া হয়, অন্য কোন কিরাআতে (কুরআন) পড়ার অনুমতি নেই। তার এই নির্দেশের অর্থ এটিই ছিল যে, এখন মানুষজন হেজাযের ভাষা মোটামুটি বুঝতে শিখে গিয়েছে, তাই তাদেরকে হেজাযি আরবীতে ব্যবহৃত শব্দের বিকল্প শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের কোন যৌক্তিক কারণ নেই। হযরত উসমানের এই নিদের্শের কারণেই শিয়ারা, যারা সুন্নীদের বিরোধী, তারা বলে থাকে যে, বর্তমান কুরআন ‘বিয়াযে উসমানী’ বা উসমানের রচিত গ্রন্থ। অথচ এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত! হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত আরববাসীদের পরস্পর মেলামেশার এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তারা পারস্পরিক মেলামেশার ফলে একে অপরের ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে গিয়েও মানুষজনকে (ভিন্ন) কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি দেয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই অনুমতি কেবল সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছিল এবং তা এই প্রয়োজন সাপেক্ষে ছিল যে, সেটি প্রাথমিক যুগ ছিল, জাতি-গোষ্ঠী পরস্পর বিভক্ত ছিল আর ভাষার সামান্য পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন শব্দের অর্থও বদলে যেত। এই ত্রুটির কারণে সেসব গোত্রে প্রচলিত কিছু শব্দ সাময়িকভাবে প্রকৃত ওহীর বিকল্প হিসেবে খোদা তা'লার ওহী অনুসারে পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল যেন কুরআন শরীফের নির্দেশাবলী বুঝতে ও এর শিক্ষামালা বুঝার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, আর প্রত্যেক (আঞ্চলিক) ভাষাভাষী নিজ ভাষার বাগধারায় এর নির্দেশাবলী বুঝতে পারে এবং স্ব স্ব রীতিতে পড়তে পারে। যখন এই অনুমতির পর বিশ বছর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন যুগের অবস্থা এক নতুন রূপ ধারণ করে, জাতি-গোষ্ঠীগুলো এক নতুন রং ধারণ করে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরববাসী এক অসাধারণ জাতি, বরং বলা যায় এক অসাধারণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়; দেশে আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন তাদের কর্তৃত্বে চলে আসে, প্রশাসনিক পদের বণ্টন তাদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যায়, শাস্তি ও বিচার ব্যবস্থার প্রচলনও তারাই আরম্ভ করে; এই সব কিছুর পর কুরআনের প্রকৃত ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষজনের আর কোন সমস্যা ছিল না। আর অবস্থা যখন এরূপ দাঁড়ায়, তখন হযরত উসমান (রা.)-ও সেই সাময়িক অনুমতি, যা কেবলমাত্র সাময়িক প্রয়োজনে প্রদান করা হয়েছিল, সেটিকে রহিত করেন, আর এটি-ই আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু শিয়ারা যেটিকে হযরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অপরাধ আখ্যা দেয় তা এ-ই যে, তিনি ভিন্ন ভিন্ন কিরাআত বন্ধ করে কেবল এক-অভিন্ন কিরাআতের প্রচলন করেন, অথচ যদি তারা গভীরভাবে চিন্তা করত তাহলে সহজেই বুঝতে পারত যে, খোদা তা'লা বিভিন্ন কিরাআতে কুরআন শরীফ পড়ার অনুমতি ইসলামের দ্বিতীয় যুগে দিয়েছিলেন, প্রাথমিক যুগে তা দেন নি। এর পরিষ্কার অর্থা হলো, যদিও কুরআন শরীফ হিজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিরাআতের ভিন্নতা হয়েছে অন্যান্য গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর। যেহেতু কখনো কখনো এক গোত্র ভাষাগত দিক থেকে অন্য গোত্রের সাথে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রাখতো, হয় তারা উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারতো না বা অর্থগত দিক থেকে সেই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেতো, তাই মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অধীনে কতিপয় বিতর্কিত শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তনের বা সেই শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু এতে কুরআনের আয়াতের অর্থ বা তাৎপর্যে কোন পার্থক্য হতো না; বরং যদি এই অনুমতি না দেয়া হতো, তাহলেই পার্থক্য সৃষ্টি হতো। যেমন এই বিষয়টির প্রমাণ এ ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) একটি সূরা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে একভাবে পড়িয়েছেন, আর হযরত উমরকে আরেকভাবে পড়িয়েছেন। কারণ হযরত উমর সম্পূর্ণ শহুরে মানুষ ছিলেন, আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ মেষ চরাতেন, এজন্য বেদুইন

লোকদের সাথে তার বেশি সম্পর্ক ছিল; আর উভয় ভাষার মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। একদিন আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ কুরআন শরীফের সেই সূরাটিই পড়ছিলেন, আর ঠিক সেই সময়েই হযরত উমর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে সেই সূরা কিছুটা ভিন্নতার সাথে তিলাওয়াত করতে শোনেন। তিনি খুব অবাক হন যে, এটি কেমন কথা, শব্দাবলী এক রকম আর পাঠ করছে ভিন্ন রীতিতে। সুতরাং তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে বলেন, চল মহানবী (সা.)-এর কাছে এক্ষুনি তোমার বিষয়টি উপস্থাপন করছি। তুমি সূরার কতিপয় শব্দাবলী ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছ, অথচ মূল সূরা অন্য রকম। যাহোক তিনি তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এই সূরা আমাকে এক রীতিতে পড়িয়েছেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ভিন্ন রীতিতে পাঠ করছিলেন। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে বলেন, তুমি কীভাবে পাঠ করছিলে? তিনি ভয়ে কম্পমান ছিলেন যে, আমি কোথাও ভুল করছি নাতো? কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, ভয় পেও না, পড়। তিনি পাঠ করে শুনালে মহানবী (সা.) বলেন, একেবারে সঠিক পড়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি তো আমাকে ভিন্নভাবে পড়িয়েছেন। তিনি (সা.) বলেন, সেটিও ঠিক আছে। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, কুরআন করীম সাতটি কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা এরূপ তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়ে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা করো না। এ প্রার্থক্যের কারণ মূলত এটিই ছিল যে, মহানবী (সা.) মনে করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ মরুচারী এবং তার উচ্চারণ রীতি ভিন্ন। তাই তার উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী যে কিরাআত ছিল তা তাকে পড়িয়েছেন। হযরত উমর সম্পর্কে তিনি (সা.) ভাবেন, সে খাঁটি শহুরে, তাই তাকে মূল মক্কী ভাষায় অবতীর্ণ কিরাআত শিখিয়েছেন। অতএব তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদকে তার ভাষায় সূরা পাঠের অনুমতি দেন এবং হযরত উমর (রা.)-কে খাঁটি শহুরে ভাষায় সেই একই সূরা পড়ান। এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য, যা ভিন্ন ভিন্ন কিরাআতের কারণে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুতে এর কোন প্রভাব পড়ত না। প্রত্যেকে বুঝতে পারতো যে, এটি সংস্কৃতি-সামাজিকতা, শিক্ষা এবং ভাষার পার্থক্যের এক আবশ্যকীয় ফলাফল। পুনরায় তিনি বলেন, যখন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্রীয় অবস্থা এক জাতি ও এক ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং সবাই হিজাযী ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান মনে করেন এবং তিনি যথার্থ মনে করেছেন যে, এখন এই (ভিন্ন ভিন্ন) কিরাআতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা মতবিরোধ দীর্ঘ করার কারণ হবে, তাই এসব কিরাআতের সাধারণ ব্যবহার এখন বন্ধ করা উচিত। অবশিষ্ট কিরাআতের পাণ্ডুলিপি তো সংরক্ষিত থাকবেই। সুতরাং এ সুধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি সার্বজনীন ব্যবহারে হিজাযী ও মূল কিরাআত ব্যতীত অবশিষ্ট কিরাআত নিষিদ্ধ করেন এবং আরব-অনারব সবাইকে এক ও অভিন্ন কিরাআতে একত্রিত করতে তিলাওয়াতের জন্য এমন অনুলিপি তৈরির অনুমতি প্রদন করেন যা প্রাথমিক যুগের কিরাআত অনুসারে ছিল।

কিছু স্মৃতিচারণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে (বর্ণিত হবে)। আজও পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য এবং বিশ্বের যেখানেই আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন তাদের সকলের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূর করুন এবং বিশেষত পাকিস্তানে (দেশীয়) আইনের কারণে বিভিন্ন সময় সমস্যা তৈরি করা হয়। আহমদীদের এখন কোন স্বাধীনতা নেই। একইভাবে আলজেরিয়ায়ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা, আহমদীদেরকে এসব বিপদ থেকে মুক্ত করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করব, এটি চীনি ডেস্কের ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রীয় আইটি টিমের সাহায্যে এই ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। যার ফলে মানুষ চীনা ভাষায় ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাবে। এই ওয়েবসাইটটি জামা'তের মূল ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও এবং পৃথকভাবেও ভিজিট করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন শিরোনামে এতে তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে। চীনা ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের নতুন সংস্করণও এতে রয়েছে। এছাড়াও তেইশটি বিভিন্ন পুস্তক ও লিফলেট রাখা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিরোনামের অধীনে হুযূর আকদাস (আ.) এবং খলীফাদের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম পাতায় জামা'তের বিভিন্ন ৬টি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেয়া হয়েছে। এছাড়া যোগাযোগের জন্য ফোন, ফ্যাক্স এবং ইমেইল ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে। এই ওয়েবসাইট চীনা জনসাধারণের জন্য হেদায়েতের কারণ হবে এছাড়া ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে; আল্লাহ্ তা'লার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা।

এছাড়া আমি প্রয়াত কয়েকজনের জানাযার নামাযও পড়াব। প্রথমত যার উল্লেখ করব তিনি হলেন, মোহতরম মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেবের দাদা হযরত মিয়া মুরাদ বখশ সাহেব এবং তার ভাই হযরত হাজী আহমদ সাহেব হযরত

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা হাফেজাবাদ জেলার অন্তর্গত মৌজা প্রেম কোট থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়েছিলেন। এই কাফেলাতে হযরত হাজী আহমদ সাহেবও ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে তবাররুক স্বরূপ পানি চাইলে তিনি (আ.) তা প্রদান করেন। মোকাররম ইউনুস খালেদ সাহেব রাবওয়া থেকে মেট্রিক পাস করে জামেয়ায় ভর্তি হয়ে যান এবং জামেয়াতে অধ্যয়নরত অবস্থায় আরবীতে সম্মানও সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৮০ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাস করেন। এরপর ৪০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। পাকিস্তানেও এবং বহির্বিশ্বে আফ্রিকায় কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মরিয়ম সিদ্দীকা, এক পুত্র আতিক আহমদ মুবাশ্বেরকে রেখে গেছেন, যিনি জামা'তের মুরব্বী। এই আতিক আহমদ মুবাশ্বের সাহেব বলেন, আমার পিতা সৎকর্মশীল আলেম ছিলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন, খোদা তা'লা আমার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মতো ব্যবহার করেছেন। যখনই আমার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহ্ তালা নিজ অনুগ্রহে তা পূর্ণ করে দেন আর আমি নিজেও এটি কয়েকবার দেখেছি। এই ছেলেই রানা মোবারক সাহেবের বরাতে আরো বলেন, রানা সাহেব লাহোরের হালকা প্রেসিডেন্ট ছিলেন; তিনি বলেন, জামা'তী কোন কাজ এলে শ্রদ্ধেয় মুরব্বী সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তা সম্পাদন করতেন। এমনকি জুতা পরেছেন কিনা তা-ও চিন্তা করতেন না। তৎক্ষণাৎ দ্রুততার সাথে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেন। আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। হরিপুর হাজারার আমীর সাহেব বলতেন, মুরব্বী সাহেব পুরো তরবেলা জামা'তের জন্য চাঁদা দেয়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ছিলেন। প্রয়াত পুণ্যাত্মা সদস্যদের চাঁদাও তিনি রীতিমত প্রদান করতেন। তার ভায়রা বলেন, চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন বিশেষভাবে তাঁর ওসিয়্যতের চাঁদা আদায়ে সর্বদা সোচ্চার থাকতেন। মরহুম খুবই দোয়াগো ও দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মরহুম দরিদ্র অভাবীদের খুঁজে খুঁজে গোপনে তাদের সাহায্য করতেন। আত্মীয়স্বজনের মাঝে দরিদ্রদের মেয়েদের বিয়ে উপলক্ষ্যে গয়নাগাটি ও জিনিসপত্র কিনে দিতেন। মরহুমের আত্মীয়স্বজন বলেন, আমরা একজন আন্তরিক, স্নেহশীল ও আর্থিক সাহায্যকারী অতি প্রিয় অনুগ্রহশীল ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, আইভরি কোস্টের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নিযামুদ্দীন বুদ্দন সাহেবের। তিনি গত ১৫ মার্চ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা মরিশাসে অর্জন করেন। ১৯৬৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন এবং পাকিস্তানে এসে তিনি প্রথমে তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট করেন, এরপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি ডো মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. করেন। ১৯৭৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে নাইজেরিয়ার আহমদীয়া ক্লিনিকে ক্লিনিক-ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ঘানা সফরে যান, সেসময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের প্রতিনিধি দল ঘানায় এসে হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করে। সেই প্রতিনিধি দল হুযুরের সমীপে আবেদন করে যে, যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘানার হাসপাতাল আছে, অনুরূপ হাসপাতাল আমাদের আইভরিকোস্টেও খোলা হোক। যাহোক, হুযুর তার অনুমোদন দেন এবং এর জন্য কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ১৮ মার্চ ১৯৮৩ সালে ডাক্তার সাহেব লেগুস থেকে আইভরি কোস্টে চলে যান এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। যেহেতু, ফ্রেঞ্চ ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল আর তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানতেন, তাই তাকে নাইজেরিয়া থেকে সেখানে পাঠানো হয় এবং সেখানে তিনি আহমদীয়া ডিসপেনসারি খোলার অনুমতি পেয়ে যান। ১৯৮৪ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি আইভরি কোস্টে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তার সহধর্মিণীও ইন্তেকাল করেছেন। তার এক পুত্র আছে, যার নাম হলো বশিরুদ্দীন মাহমুদ বুদ্দন এবং কন্যা নাশমিয়া আয়েশা ওয়ারদা। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্তানদেরও খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

আইভরি কোস্ট-এর আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ আব্দুল কাইয়ুম পাশা সাহেব বলেন, আইভরি কোস্টে প্রায় ছত্রিশ বছর আহমদীয়া ক্লিনিক আবিজান-এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে তিনি সেবা প্রদান করেছেন। তিনি একজন খুব ভালো ডাক্তার, একজন ভালো মানুষ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আইভরি কোস্টের একজন বিশিষ্ট পুণ্যাত্মা সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, খাকসারের সাথে ডাক্তার সাহেবের প্রায় আঠারো বছরের সম্পর্ক ছিল। সর্বাবস্থায় তাকে ভালো মানুষ হিসেবে পেয়েছি। সবাইকে সাহায্যকারী, জামা'তী কাজে সঠিক পরামর্শদাতা, অতিথিপরায়ণ, সদাচারী, আর সুবসন-সুবচন মানুষ ছিলেন। জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্বেও নিয়েজিত ছিলেন। অনেক উদারমনা

মানুষ ছিলেন। শিশুদের সাথে পরম স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। অধিকাংশ সময় শিশুদেরকে তোহফা স্বরূপ দেয়ার জন্য ক্লিনিকে কিছু রাখা থাকত। যেসব অসুস্থ্য শিশু আসত তাদেরকে তোহফাও দিতেন, অর্থাৎ খেলনা, টফি প্রভৃতি। মিশনে অবস্থানরত শিক্ষার্থী এবং গরীব আহমদী পরিবারদের অনেক সাহায্য করতেন।

সেখানকার একজন মুবাল্লেগ লিখেন, তার কাছে যখন কোন রোগী থাকত না তখন তাকে কোন খাদেম অথবা কোন নাসেরের তালীম ও তরবিয়তে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। এমন নয় যে, রোগী না থাকলে বসে থাকবেন। কোন না কোন জামা'তী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। এক্ষেত্রে কখনো মলফুযাত অথবা জুমুআর খুতবার ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনুবাদ করতেন এবং জামা'তের বন্ধুদেরকে তার ফটোকপি করে পাঠাতেন। তিনি সর্বদা মানবতার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। নিজ খরচে রোগীদের ঔষধ ক্রয় করে দিতেন। কখনোবা দরিদ্র লোকদের বা অন্যদেরও ঘরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, চাউল, তেল প্রভৃতি তিনি সরবরাহ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা ডাক্তার রাজা নাসীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী সালমা বেগম সাহেবার যিনি গত ২৪ জানুয়ারি তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তার পিতা রাজা ফযল দাদ খান সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ বংশের প্রথম আহমদী ছিলেন। যারা লিখেছেন তারা অর্থাৎ তার সন্তানরা তার সম্পর্কে লিখেছে যে, তার নামাযের দৈর্ঘের দৃষ্টান্ত প্রবাদস্বরূপ পুরো পরিবারেই সুপ্রসিদ্ধ ছিল। খুবই সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবের অধিকারিণী, সেবাপরায়ণ, ত্বাকওয়াশীলা, বিশ্বস্ত, সাহসী, বড়মনা, বুদ্ধিমতি ও পরম উদ্যমী, উন্নত চরিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ, অনেক দোয়াগো, অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, স্বল্পেতুষ্ট এবং আল্লাহ্‌র ওপর আস্থাশীলা মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি দুই পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো, আল্ শিরকাতুল ইসলামিয়া, যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা কিশওয়ার তানভীর আশরাফ সাহেবার, যিনি গত ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুমা পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে নিজ বার্ধক্যে বিভিন্ন রোগব্যাধির মোকাবিলা করেছেন আর খোদা তা'লার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থেকে স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তার অবর্তমানে দুই পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। একইভাবে অনেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক জামাতা নাসীর উদ্দীন সাহেব বর্তমানে যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর হিসেবে কাজ করার তৌফিক পাচ্ছেন। ছেলে নাবীল আরশাদও সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগেও আর আমিও যখনই কোন কাজের জন্য তাকে ডেকেছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। মরহুমা অগণিত গুণের আধার ছিলেন। খুবই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। (তিনি) অত্যন্ত বিনয়ী, একজন নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবতী ও পুণ্যবতী নারী ছিলেন। নিয়মিত নামায-রোযায় অভ্যস্ত এবং চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে ত্বরিত ছিলেন। সর্বদা মনখুলে সদকা-খয়রাত করতেন। আরশাদ বাকী সাহেব লিখেছেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডনে বসবাস করেছেন, এ সময়ের মধ্যে ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লন্ডনে হিজরতের পর তিনি আমার সাথে জামা'তী কর্মকাণ্ডে অনেক সহযোগিতা করেছেন আর সর্বদা জামা'তের কাজকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সবদিক থেকে নিজের ঘরকে শান্তিপূর্ণ ও জান্নাত প্রতীম বানিয়ে রেখেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলতেন, শান্তির দিক থেকে এই ঘরটি আমার পছন্দনীয়। তার মেয়ে বলেন, সর্বাবস্থায় খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতেন। সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় সানন্দে নিয়তির বিধান মেনে নিতেন আর কখনো কোন অভিযোগ-অনুযোগ করতেন না। তিনি সৌদি আরবেও ছিলেন। যেসব আহমদী বন্ধুরা সেখানে হজ্জ বা উমরা করতে যেতেন, তিনি তাদের অনেক সেবার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো সুদান নিবাসী আব্দুর রহমান হুসেইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেবের। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর (মাত্র) ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । আহমদীয়া জামা'তের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে তিনি কোন ইসলামী ফির্কার সাথে যুক্ত ছিলেন না বরং তার বিভিন্ন বিশ্বাস যেমন, নাসেখ-মনসুখ এবং জিন্ন ইত্যাদি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তার বড় ভাই উসমান হুসেইন সাহেব সৌদি আরবে কাজ করতেন। সেখানে জামা'তের সাথে তার পরিচয় হলে তিনি প্রয়াত আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে তা উল্লেখ করেন, এটি ২০০৭ সালের কথা। ভাইয়ের কাছে আহমদীয়াত সম্পর্কে

শোনার পর থেকে আব্দুর রহমান সাহেব এম.টি.এ. দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সে সময় তার এলাকায় এম.টি.এ.-র সম্প্রচার দেখা কষ্টসাধ্য ছিল, এজন্য তিনি অনেকগুলো ডিশ এন্টেনা পরিবর্তন করেন, অনেক অর্থ খরচ করেন আর অবশেষে তিনি এম.টি.এ. (চ্যানেল) পেয়ে যান। এরপর থেকে তার রীতি ছিল, কাজ থেকে ফিরে অধিকাংশ সময় এম.টি.এ. দেখে কাটাতেন। অবশেষে আশ্বস্ত হওয়ার পর ২০১০ সালে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। বয়আত করার পর তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে তবলীগ করেন। মরহুমের পুণ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আতিথেয়তা, দরিদ্রদের লালন এবং মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। ২০১৩ সালে সুদানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন আর এজন্য তিনি অকাতরে আর্থিক কুরবানীও করেছেন। মরহুম অনেক দরিদ্র আহমদীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। সুদানের একটি অঞ্চলে বসবাসকারী এক অত্যন্ত দরিদ্র গোত্রের আহমদী যখন এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত হয় তখন মরহুম উদারহস্তে তাদের আর্থিক সাহায্য করেন এবং তার প্রয়োজনাদির প্রতি খেয়াল রাখেন। এছাড়া অন্যদের প্রতিও যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবার নিজের গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থান থেকে আহমদীদের নামায সেন্টারে নিয়ে আসতেন আবার জুমুআর নামাযের পর তাদেরকে নিজেদের বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। অ-আহমদীরাও তার সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করেন। নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন আর উদারহস্তে খরচ করতেন। সুদানের প্রথম মজলিসে আমেলাতেও তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন আর আমৃত্যু উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম তার অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও দুই পুত্র এবং দু'জন কন্যা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জামা'ত এবং খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও সুদৃঢ় করুন আর মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন।

আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (ইনশাআল্লাহ্)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

ওয়াকফে আরযী সংক্রান্ত জরুরী এলান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বাংলাদেশ জামা'তের সদস্যদের জন্য চলমান অর্থবছর অর্থ্যাৎ জুন-২০২১ শেষ হবার পূর্বে ১০০০ ওয়াকফে আরযী সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এই লক্ষ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব হুযূর (আই.)-এর নিকট থেকে ৭ দিনের অনুমতি আনান।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পরামর্শ হল, আপনারা এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত ওয়াকফে আরযী করবেন। যাতে একজন ওয়াকফে আরযীকারী তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন। এখনও অনেক জামা'ত হতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। আপনার জামা'ত হতে এখনো কোন সদস্য যদি এ মুবারক তাহরীকে অংশ না নিয়ে থাকেন তাহলে অনুগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে তাদেরকে স্মরণ করান। এমন যেন না হয়, আমাদের দুর্বলতার কারণে কোন সদস্য যুগ-খলীফার এ আশীষ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আপনারা আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ৭ দিনের জন্য অন্তত একবার জামা'তের কাছে পেশ করে যুগ-খলীফার তাহরীকে লাব্বায়িক বলুন। আমরা ইনশাআল্লাহ্ হুযূর (আই.)-এর দেয়া টার্গেট পূরণ করতে পারবো। আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ওয়াসসালাম।

খাকসার
ইনসান আলী ফকির
ন্যাশনাল সেক্রেটারি তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

সীরাতুল মাহদী (আ.)

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মওলানা জুবায়ের আহমদ বিপু**

(৩য় কিস্তি)

হাদীস শরীফেও এসেছে যে, মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এরও প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল, মারাত্মক অস্থিরতা, উদ্বিগ্নতা ও যাতনার অবস্থা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় অনেকটা একই রকম অবস্থা ছিল। এই কথাটি অজ্ঞদের জন্য একটি আশ্চর্যের বিষয় হবে। কেননা অপরদিকে তারা এটি শুনে আর দেখে আসছে যে, সুফি ও আওলিয়াদের মৃত্যু নিতান্তই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকৃত বিষয়টি হলো যে, নবী যখন ওফাত পেতে থাকে তখন নিজ উম্মত সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ববোধ তাঁর সম্মুখে থাকে। আর তাদের ভবিষ্যতের চিন্তা অত্যন্ত তীব্রভাবে তাঁর ওপর জেঁকে বসে। দুনিয়ার সকলের চেয়ে বেশি এই বিষয়টি নবী জানে আর বুঝে যে, মৃত্যু একটি দরজা মাত্র- যা অতিক্রম করে মানুষকে আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হয়। আসন্ন মৃত্যু যেখানে একদিক থেকে তাদের আনন্দিত করে যে, প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যের ক্ষণ সন্নিকটবর্তী অপরদিকে তাদের ওপর অর্পিত মহান দায়িত্ববোধের অনুভূতি এবং নিজ উম্মত সম্পর্কিত ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা তাঁকে প্রচণ্ড রকম উদ্বিগ্নতায় নিপতিত করে। কিন্তু সুফি ও আউলিয়ারা এই সমস্ত চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত। তাদের ওপর শুধুমাত্র নিজ নফসের দায়িত্বই বর্তায় কিন্তু নবীদের ওপর হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের বোঝা থাকে। অতএব (উভয় প্রকারের মানুষের মৃত্যুর সময়কার অবস্থার মাঝে) পার্থক্য সুস্পষ্ট।

(এই বর্ণনায় হযরত আম্মাজান এটা বর্ণনা করেছন যে, তাঁর উদ্বিগ্নতার বহিঃপ্রকাশের দরুণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটা বলেছেন যে, “এটা তাই যা আমি বলছিলাম”। এই সম্পর্কে আমি হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, এর অর্থ কী? যার ভিত্তিতে তিনি বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই কথাটির অর্থ হচ্ছে, যেমনটি আমি বলে আসছিলাম আমার ওফাতের সময় সন্নিকটবর্তী। সুতরাং এখন সেই প্রতিশ্রুত ক্ষণ এসে গেছে। আর হযরত আম্মাজান বললেন, এই বাক্য দ্বারা একদিক থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, ভয় পেয়ো না; কেননা এটাই সেই নির্ধারিত সময় যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে জেনে আমি বর্ণনা করতাম। আর যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে ঠিক একইভাবে আমার ওফাতের পর আল্লাহ্ তা'লার কৃত ঐশী সাহায্য সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ হবে। আর আল্লাহ্ স্বয়ং তোমাদের সকলের অভিভাবক হবেন। হযরত আম্মাজান আরও বর্ণনা করেন যে, মাঝে মাঝেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পেটের পীড়া হত। ফলে কখনো কখনো অনেক দুর্বল হয়ে যেতেন আর তিনি (আ.) এই অসুস্থতাতেই ওফাত প্রাপ্ত হন।)

১৩। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম:- হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল ওসীয়্যত বই লিখছিলেন সেই সময়ের কথা। একদা তিনি (আ.) শরিফ (অর্থাৎ আমার আদরের ছোট ভাই মির্যা শরিফ আহমদ) এর বাড়ির উঠোনে পায়চারি করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, একবার মৌলবি মোহাম্মদ আলী সাহেবের নিকট জনৈক ইংরেজ জিজ্ঞেস করল, যেভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে থাকে সেভাবে মির্যা সাহেবও কী কাউকে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেছেন? এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, ‘আমি কি মাহমুদকে [খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.)] লিখে দিব’, অথবা বলেছেন, ‘নির্ধারণ করে দিব।’ এ বিষয়ে তোমার কি মতামত? তখন হযরত আম্মাজান বললেন; আপনি যা সমীচীন মনে করেন।

১৪। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম:- হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন– আমাদের জামা'তে তিন প্রকারের লোক রয়েছে। প্রথমত সেই

সমস্ত লোক যাদের জাগতিক চাকচিক্যের বাসনা রয়েছে যেমন; একটা রাজ্য থাকবে, মন্ত্রনালয় থাকবে, বড় বড় অট্টালিকা থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর দ্বিতীয়ত তারা যারা কোন বিশেষ ব্যক্তির যেমন, মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেবের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেই ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে। তৃতীয়ত সেই সমস্ত লোক যারা আমার ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ততা রাখে আর তারা সকল কিছুর ওপর আমার সন্তুষ্টিকে ও আনন্দকে প্রাধান্য দেয়।

১৫। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ- আমার মনে পড়ে, লাহোরে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ওফাত প্রাপ্ত হন, সে সময় মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেব সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন না যেখানে তিনি (আ.) ওফাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেব বিষয়টি অবগত হলেন তিনি তৎক্ষণাৎ আসলেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কপালে চুমু দিলেন আর দ্রুতই সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেই না হযরত মৌলবী সাহেব দরজার বাহিরে আসলেন তখনই মৌলবি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আহসান সাহেব অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেবকে বললেন; "আনতা সিদ্দিকী"। তখন মৌলবি নুরুদ্দীন সাহেব বললেন, মৌলবি সাহেব এই প্রশ্নটি এ পর্যন্তই থাক। কাদিয়ানে গিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। খাকসারের স্মরণ আছে এই বাক্যালাপগুলো আমি ছাড়া অন্য কেউই শুনে নি।

১৬। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ- আমার স্মরণ আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিনটি আংটি ছিল প্রথমটি হচ্ছে **"আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু।"** মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর প্রবন্ধের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করেছেন। এটিই সর্বপ্রথম আংটি যা তাঁর (আ.) দাবির বহু পূর্বেই বানানো হয়েছিল। দ্বিতীয় সেই আংটি যার মাঝে তাঁর (আ.) ওপর অবতীর্ণ ইলহাম- **"গারাসতু লাকা বিইয়াদি রাহমাতি ওয়া কুদরাতি ..."** খচিত আছে। এটি তিনি (আ.) দাবির পর প্রস্তুত করেছিলেন। আর এটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর (আ.) হাতে শোভা পেত। ইলহামটি তুলনামূলক লম্বা হওয়ার কারণে এই আংটিটির পাথর সবচেয়ে বড় ছিল। তৃতীয়টি শেষ বছরগুলোতে নির্মিত হয়েছিল আর এটা মৃত্যুর সময়ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে ছিল। এই আংটিটি তিনি (আ.) স্বয়ং তৈরি করেন নি বরং কেউ একজন নিবেদন করেছিলেন যে, হুযূর আমার বাসনা হল, আপনার জন্য একটি আংটি তৈরি করব। আংটির ওপর কী লিখব, এটি জিজ্ঞস করলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– **"মাওলা বাস"**। সুতরাং সেই ব্যক্তি উক্ত শব্দসমূহ খচিত করে আংটিটি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদান করেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁর (আ.) হাত থেকে এই আংটিটি খুলে নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে হযরত আম্মাজান তা ফেরত নিয়ে নেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওফাতের একটি নির্দিষ্ট সময় পর হযরত আম্মাজান এই তিনটি আংটি আমাদের তিন ভাইকে দেয়ার জন্য লটারি করলেন। **"আলাইসাল্লাহু বিকাফিন আবদাহু"** খচিত আংটিটি বড় ভাইজান অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নামে উঠলো। (তাযকেরাহ পৃ. ৪২৮ প্রকাশনা: ২০০৪) **"গারাসতু লাকা বিইয়াদি রাহমাতি ওয়া কুদরাতি ..."** আংটিটি খাকসারের নামে আর **"মাওলা বাস"** খচিত আংটিটি স্নেহের শরীফ আহমদের নামে উঠলো। ভাইদের ভাগে দুটি একই রকমের তবারুক বন্টিত হল।

১৭। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ- হযরত আম্মাজান আমাকে বলেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার নিকট বর্ণনা করেছেন– একদা আমি একটি মুকদ্দমার আজ্ঞানুবর্তিতায় উপস্থিত হই। আদালতে একের পর এক মুকদ্দমা চলছিল আর আমি বাহিরে গাছের নিচে অপেক্ষমান ছিলাম। যেহেতু তখন নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল তাই আমি নামায পড়া আরম্ভ করে দেই। কিন্তু নামাযরত অবস্থায় আদালতে আমার ডাক পড়ে, তা সত্ত্বেও আমি নামায অব্যাহত রাখি। নামায শেষে আমি দেখি, আমার নিকটে আদালতের পেয়াদা দাঁড়িয়ে আছে। সালাম ফেরানোর সাথে সাথে আমাকে বলল, মির্যা সাহেব আপনাকে মুবারকবাদ, আপনি মুকদ্দমায় জয়লাভ করেছেন।

১৮। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমঃ- হযরত আম্মাজান আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের যুবক বয়সের বর্ণনা করতেন যে, সেই সময়ে আমি অবগত হলাম অথবা বলেছেন; আমাকে জানানো হল যে, এই রাস্তায় উন্নতি সাধনের নিমিত্তে রোযা রাখাও আবশ্যক। তিনি (আ.) বলতেন– এরপর আমি ছয় মাস অনবরত রোযা রেখেছি। আর ঘরে কিংবা বাহিরের কেউ আমার রোযা রাখা সম্পর্কে অবগত ছিল না। ঘর থেকে সকালের খাবার আসলে তা আমি কোন অভাবিকে দিয়ে দিতাম আর রাতের খাবার আমি নিজে খেয়ে নিতাম। আমি হযরত আম্মাজানকে জিজ্ঞেস করলাম যে, শেষ বয়সেও কী তিনি (আ.) নফল রোযা রাখতেন? আম্মাজান বললেন– শেষ বয়সেও তিনি (আ.) রোযা রাখতেন যেমন শাওয়াল মাসের ছয় রোযা একাগ্রতার সাথে রাখতেন। যখনি বিশেষ কোন বিষয়ে দোয়ার প্রয়োজন হতো তখনি তিনি (আ.) রোযা রাখতেন। কিন্তু হ্যাঁ! জীবনের শেষ দু'তিন বছরে অত্যন্ত দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে রমযানের রোযা রাখা সম্ভব হতো না। (আমার জানা মতে কিতাবুল বারিয়্যাতে সময়কাল আট-নয় মাস বর্ণনা করেছেন)... *(চলবে)*

পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়

আনোয়ারা বেগম

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার।" *(সূরা বাকারা: ১৮৬)*

আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় রোকন বা স্তম্ভ হল রোযা। এই রোযা বা উপবাস-ব্রত পালন সকল ধর্মেই কোন না কোন আকারে পাওয়া যায়।

বছরের অসাধারণ ও অন্যতম একটি মাস হচ্ছে রমযান, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে।" *(সূরা বাকারা: ১৮৬)*

বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।"

সূফীগণ লিখেছেন, "এ মাসে বান্দার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া, এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশ্‌ফ' বা 'দিব্যদর্শন' লাভ হয়ে থাকে। নামায তাযকিয়া-এ নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধি সাধন করে এবং রোযাতে 'তাজাল্লীয়ায়ে-কাল্‌ব (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধন হয়।"

রমযানের ইবাদত সম্বন্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছেন, 'মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি।'

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য দৈহিক-সম্পর্ক কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ একান্তই প্রয়োজন। খোদা তা'লার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। ইসলাম ধর্মে মূলত এই রোযা পালনের মধ্যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। অর্থাৎ ইসলাম রোযাকে পূর্ণ মাত্রার আত্মোৎসর্গ-স্বরূপ মনে করে থাকে। রোযার মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের জন্য যেমন নির্দিষ্ট দরজা বা পথ থাকে, তেমনি ইবাদতের দরজা হল, 'রোযা', আর রোযাদারের দরজা হল 'রাইয়ান' নামক দরজা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "রোযা ঢাল-স্বরূপ, দোযখের অগ্নি থেকে রক্ষা লাভের নিরাপদ দূর্গ।" পবিত্র রমযানের শিক্ষা হল, দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে রোযা রাখার পাশাপাশি ফরয ইবাদত আদায়ের সাথে রাত জেগে নফল ইবাদত করা, অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করা। কারণ, কুরআন ও রমযান ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এ মাসে কুরআন তেলাওয়াত এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, মহানবী (সা.)-কে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) কুরআন পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন। রমযানে বিনীতভাবে দোয়া করার পাশাপাশি ঝড়ের গতিতে দান-সদকাহ্ করতে থাকা, যার ওপরেও আদেশ প্রদান করা হয়েছে। নাফ্‌সের যাবতীয় কু-প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা আর বেশি বেশি যিকরে ইলাহী করা, যা আত্মাকে সতেজ রাখে। কম আহার গ্রহণে আত্মশুদ্ধি ও কাশ্‌ফি শক্তি বা দিব্যদর্শন-শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়। রোযাদার সর্বদা আল্লাহ্‌র হাম্‌দ, তস্‌বীহ ও তাহ্‌লীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয়-খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়।" *(আল্-হাকাম, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ)*

"লাআল্লাকুম তাত্তাকুন" *(সূরা বাকারা: ১৮৬)*। রমযান মাস হলো তাক্‌ওয়া অর্জনের মাস। বান্দা নিজেদের মাঝে এক অভিনব পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর নৈকট্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। সংযমী মনোভাব গড়ার পাশাপাশি তাক্‌ওয়া-ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং রূহানীয়াত লাভের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয় এই মাস। অর্থাৎ, পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে সারা বছরের ঘাটতি পূরণের অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়।

এই মাসের মধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ রাত হল "লায়লাতুল ক্বদর", যা হাজার রাত্রি অপেক্ষা উত্তম। এই রাতে অধিক হারে ইবাদত ও দোয়া করার পাশাপাশি কুরআন পাঠ এবং বেশি বেশি করে তওবা ও ইস্তেগফার করার অতুলনীয় সুযোগ এনে দেয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য এ রমযান সবদিক দিয়ে বরকতময় করুন, আমীন।

পর্ব-১১

প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)-এর সাথে মোলাকাতে প্রশ্নোত্তর

[৩১ অক্টোবর ২০২০ জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের সাথে]

গত ৩১ অক্টোবর ২০২০ জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ার একশ'র অধিক ছাত্রদের সাথে হুযূর (আই.)-এর ভার্চুয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে ছাত্ররা হুযূরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেছিল। ক্লাসের চুম্বক অংশ পাঠকদের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলো, এ যুগে অনেক লোক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। আমরা তাদেরকে কী উত্তর দিতে পারি?

প্রিয় হুযূর: প্রথম কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে স্বয়ং বলেছেন, **"ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহানাতাকা"** অর্থাৎ যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করতে চায়, আমি স্বয়ং তাদেরকে লাঞ্ছিত করব। অর্থাৎ আমি তাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে লাঞ্ছিত করব। এমনকি তাদের সন্তানরাও লাঞ্ছিত হবে। যারা সজ্ঞানে এই দুঃসাহস দেখায়, তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ নিজেই মিমাংসা করবেন। কিন্তু আমাদের উত্তর সেটিই হওয়া উচিত যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা ধৈর্য ধারণ করো আর কোন ব্যক্তির রূঢ় কথার পিঠে শক্ত ভাষা ব্যবহার করো না। তোমরা বিবাদে জড়াবে না। জানি তোমরা আমাকে অনেক ভালবাসো। তবুও তোমরা বিবাদে জড়াবে না। ভেবে দেখো! আমরা তো এ যুগে মহানবী (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেয়ে বেশি ভালবাসি। কিন্তু বর্তমানে ফ্রান্সে আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মহানবী (সা.)-এর কার্টুন বানিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। এর প্রতিক্রিয়া আমরা কীভাবে ব্যক্ত করছি? আমরা বলছি, সবাই মহানবী (সা.)-এর প্রতি অধিকহারে দরূদ প্রেরণ করুন। আর আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করি, তখন মুহাম্মদের (সা.)-এর বংশধরদের প্রতিও দরূদ প্রেরণ করে থাকি। মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরসূরীরাও এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বড় উত্তরসূরী হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)। তিনি (আ.)-ই তাঁর (সা.) বংশধরের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবার সর্বাধিক যোগ্য। তাই আমাদের কাজ হল, মানুষ যখন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তখন আমরা প্রথমে দরূদ পাঠ করবো, তা মহানবী (সা.)-কে নিয়েই ঠাট্টা-বিদ্রুপ হোক, অথবা তাঁর দাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপই হোক। আমাদের উচিত, দরূদ পাঠ করা। দ্বিতীয় বিষয় হল, নিজেরা এমন আদর্শ স্থাপন করুন, যেন ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীরা এমনিতে চুপ হয়ে যায়। তারা যেন দেখে যে, আমরা হাসি-তামাশা করি অথচ এরা তো ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে। এরা তো ভালবাসা এবং সৌহার্দ্যের ফেরিওয়ালা, আমরা তাদের সাথে বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলি, এরা আমাদের সাথে ভালবাসার কথা বলে। পবিত্র কুরআনেও এ কথাই লেখা আছে, "কাআন্নাহু ওয়ালিউন হামিম" অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের সাথে উত্তম আচরণ করো, তাহলে তারা তোমাদের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বন্ধুতে পরিণত হবে। তাই আমাদের প্রতিক্রিয়া হল, আমরা নিরবে নিজেদের আমল সংশোধন করব, নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নত করব, আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হব, দোয়া করব যে, হে আল্লাহ্! এদের সংশোধন করে দাও। আর তোমার দৃষ্টিতে যদি তারা সংশোধনের অযোগ্য হয়েই থাকে, তাহলে হে আল্লাহ্! তুমি তাদের থেকে আমাদের মুক্তি দাও আর তাদেরকে

নিশ্চুপ করে দাও। যেন তারা আমাদের প্রিয়জনদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে না পারে তথা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এবং তার মনিব মহানবী (সা.)-এর অসম্মান করতে না পারে। আর আমরা যেন আনন্দিত হতে পারি। এ জগতে যখন মহানবী (সা.)-এর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা উৎফুল্ল হই। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস। তাঁর সম্মান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমরা আনন্দিত হই। তাই আমাদের দোয়া করা উচিত, আমরা যেন তাঁদের সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পারি, যেন আমরা এর মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে পারি। একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আমাদের চাইতে হবে। আমরা না লাঠি ধরব, না রাইফেল হাতে নিব আর না-ই আমরা কামান ধরব আর না ছুরি হাতে নিব। আমরা এসব কাজ করব না। আমাদের কাজ আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হওয়া, নিজেদের অবস্থা সংশোধন করা, আর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা।

প্রশ্ন: অধমের প্রশ্ন হল, আমরা ইনশাআল্লাহ্ কিছুদিন পর কর্মক্ষেত্রে যোগদান করব। সেখানে আমাদের সর্বপ্রথম কী কাজ করা উচিত?

হুযূর: সেখানে গিয়ে প্রথমে দোয়া করতে থাকবেন যে, হে আল্লাহ্! এই জায়গা, যেখানে আমার পদায়ন হয়েছে, আমাকে সঠিকভাবে, ঈমান, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য দাও। আর বিশেষত আল্লাহ্‌র সাথে আপনাদের সম্পর্ক দৃঢ় করুন। সর্বদা স্মরণ রাখবেন, দোয়ার কল্যাণে আমাদের সব কাজ হয়। তাই প্রত্যেক মুরব্বী এবং মোবাল্লেগ যখন কার্যক্ষেত্রে যায়, তখন তার এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আজকের পর থেকে আমি কখনো তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগ করব না। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করব। আপনাদের অনেক মোবাল্লেগ মারা যায়, আমি তাদের স্মৃতিচারণ যখন করি, তখন আমি বলি যে, তারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। প্রত্যেক মুরব্বীর প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়া আবশ্যক। আর তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করবেন, আল্লাহ্ যেন আপনার কাজে বরকত দেন। এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায যেখানে আপনাদের কেন্দ্র আছে, অথবা মসজিদ আছে, যদি আপনারা সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাহলে মসজিদে যাবেন আর পাঁচ ওয়াক্তের নামায মসজিদে বাজামা'ত আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। আর প্রত্যেক আহমদী যেন তাদের মোবাল্লেগের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে। যদি আহমদীদের মাঝে পারস্পরিক কোন ধরনের বিভেদ-বিবাদ থেকে থাকে, ক্ষোভ থেকে থাকে তাহলে পারস্পরিক ক্ষোভ দূর করা আপনাদের কাজ। লোকদেরকে বুঝান যে, আমরা সবাই মুমিন আর মুমিন ভাই-ভাই হয়ে থাকে। সেখানে সকল আহমদীকে আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে মিলেমিশে থাকার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করাবেন। আর কোন ধরনের ক্ষোভ যদি থেকে থাকে, তবে তা দূর করে দিন। প্রত্যেকের সাথে যেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে আর লোকেরাও যেন আপনাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখে, আপনাদেরকে যেন ভালবাসে, আপনারাও যেন তাদেরকে ভালবাসেন। এভাবে আপনারা যখন তাদেরকে কোন কথা বলবেন। তখন তারা আপনাদের কথামত কাজ করবে। একইভাবে যুগ-খলীফার সাথে নিয়মিত সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আপনি যে মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাছাড়াও প্রতি মাসে আমাকে একটি পত্র লেখার চেষ্টা করুন। যেন বুঝা যায় যে, মুরব্বী সাহেব কেমন কাজ করছেন। আর লোকদের মাঝে এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করুন, তারা যেন যুগ-খলীফার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যখন থেকে এখানে ইন্দোনেশিয়ান ডেস্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, লোকেরা আমার কাছে অনেক পত্র লেখে। অনুবাদ হয়ে আমার কাছে আসে। তাই লোকদের উৎসাহিত করুন, তারা যেন যুগ-খলীফার সাথে যোগাযোগ রাখে। আর নিয়মিত জুমুআর খুতবা শুনবেন, আর এর মাঝে যে নির্দেশাবলী থাকে, আমল করার আদেশ থাকে, তদনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করবেন। প্রথমে মুরব্বী সাহেব স্বয়ং আমল করবেন এরপর অন্যদের তাগিদ করবেন।

প্রশ্ন: অধমের প্রশ্ন হল, ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ আমাদের কী কী পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

প্রিয় হুযূর: শতবর্ষ পূর্ণ হবার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন যে, আগামী পাঁচ বছরের মাঝে আপনারা অন্তত পক্ষে ১ লক্ষ বয়াত করাবেন। আর প্রত্যেক আহমদীকে আপনারা বাজামা'ত নামাযী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে নিয়মিত কুরআন পাঠকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে খলীফার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টিকারী বানাবেন। প্রত্যেক আহমদীকে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণকারী বানাবেন। এগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হবে।... *(চলবে)*

DR. NAZIFA'S Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

কবিতা

নতুন ঈদ

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

আজকে খুশির বান ডেকেছে শাওয়ালেরই চাঁদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

ফিতরানা দাও আত্মাটারে ফিতরের এই ঈদে
জাগো মুসলিম আর রইও না না-ফরমানির নিদে,
উম্মতেরে এক হতে তাই ইমাম মাহদি কাঁদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

সব দিয়ে দাও আছে যাহা আজকে তোমার ঘরে
আবু বকর করেছে যা দ্বীন ইসলামের তরে,
ভরিয়ে তোল এই চারিপাশ পাক কালেমার গীতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

হৃদয় মেলে ধর রে আজ কুল মাখলুকাত তরে
দেখবে কেমন পূর্ণ হয় ঈদ আলোয় ভরে-ভরে
সঁপে দাও এ জীবনখানি দ্বীনেরই তাশদিদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

পাক মুহাম্মদ দাওয়াত খাবে যদি করতে পার
নাফসের কুরবানী– তবে তাঁকে পেতে পার,
তৌহিদেরই বাদাম মেল ভব তরীর নদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

এমনই ঈদ হবে তোমার পাক মসীহ্-এর যুগে
আগের গাওস কুতুব নবী যে ঈদ পাইতে কাঁদে,
ভাব কত ভাগ্য তোমার এই আখেরী যুগে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

মানবতা কাঁদছে দেখ ঈদের দেখা কই
‘জাআল মসীহ্’ ‘জাআল মসীহ্’– ডাকছে দেখ ওই,
ঈদ যদি চাও ফেল না পা প্রহেলিকার ফাঁদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

রমযানেরই রোযা শেষে উঠলো খুশির চাঁদ
ইসলামেরই গুল- বাগিচা হলো ফের আবাদ,
আখেরিনে আসলেন নবী তের সিদ্দি বাদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

জীবন চাইলে আগে তোমায় মরতে হবে ভাই
বদর ওহুদ সাক্ষী আছে মুহাম্মদ রৌশনাই,
সারা জীবন কাটাও এমন সিয়াম সাধনাতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

আল্লাহ্ মহান, নাই রে কেহ অন্য মাবুদ জন
ওয়া লিল্লাহিল হামদ ঘোষে এই বাণী নিরঞ্জন,
আখেরিন তাই দাওয়াত খায় সেই আউয়ালিনের পাতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

জ্ঞানী-অজ্ঞান, ধনী-নির্ধন নাই ভেদাভেদ আজ
দ্বীন ইসলামের প্রচারই হোক নিত্যদিনের কাজ,
হোক উদযাপন এমনই ঈদ প্রচণ্ড নিনাদে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

যুগের ইমাম ডাকছে দেখ বিশ্ব মাহফিলে
ঈদের নামায পড়বে আস– সবাই দলে দলে,
নেতা ছাড়া জামা’ত কি হয় বুঝে না বুযদীলে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

কোলাকুলি কর সবে বুকে মিলাও বুক
সালামতির বাণী শুনাও ভালোবাস খুব,
রয় না যেন দুশমনি আর মিলো এমন প্রীতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

শিরণী সেমাই মিঠাই আমার ইমামের বয়ান
যেমন করে ধমনীতে রক্ত বহমান,
তাযকিয়া হোক নফসের– আশার নতুন প্রেরণাতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

নতুন কাপড় গয়না আমার ইমান যেন হয়
জরিন ফিতায় আমল যেন সদাই শিরে রয়,
ঊর্ধ্বে নতুন আকাশ নিম্নে নতুন জমিনেতে
এলো রে ঈদ রোযার শেষে আত্মত্যাগের স্বাদে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সালানা জলসা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

২৫তম কিস্তি (পূর্ব প্রকাশের পর)

এ জলসা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ ক'জনের প্রেরিত বাণী নিম্নরূপ:

কাদিয়ানের আমীর সাহেবের তারবার্তা

৬৭তম সালানা জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ্ সকল আহমদীকে আশিসমণ্ডিত করুন এবং হুযুর (আই.)-এর নসীহতসমূহ পালন করার তৌফিক দান করুন।

অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম শাকিল আহমদ মনির এর পত্র

আমরা জামা'তে আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার সদস্যগণ আপনাদের সুখী ও সমৃদ্ধ নববর্ষ কামনা করছি। জলসায় যোগদানকারীদের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা এ জলসাকে মহা আধ্যাত্মিক বরকতের উপকরণ করুন।

এ জলসায় আমাদের জামা'তের সকল সদস্যের জন্য দোয়াতে বিশেষ স্মরণ রাখার অনুরোধ রইল। এতদসঙ্গে সিডনীতে আমাদের নতুন মসজিদ বায়তুল হুদা-এর একখানা ফটো গ্রথিত থাকলো।

শ্রীলংকাজামা'ত এর জাতীয় সভাপতি জনাব এন.এ.এম জাফরুল্লাহ এর পত্র

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর মহতী ৬৭তম জলসার অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি এবং শ্রীলংকার জামা'তের সকল সদস্য দোয়া করছি যেন আপনাদের জলসা মহান সাফল্য অর্জন করে। আমরা আশা করি, আপনাদের জলসায় উপস্থিত সকল আহমদী ভাই, বর্তমানের উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে মুসলিম উম্মাহ যে বিপজ্জনক অনৈক্য ও ধ্বংসের সম্মুখীন সে জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ্ তাদেরকে যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

দোয়া করি আল্লাহ্ যেন বাংলাদেশের জামা'তকে অফুরন্ত আশীষ বর্ষিত করেন। আমীন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর এর তারবার্তা

আপনাদের সালানা জলসা অনুষ্ঠানের পত্র পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। জলসায় যাঁরা উপস্থিত হয়েছে তাঁদের সবাইকে আমার আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের জলসাকে সঠিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমাদের এখানকার জামা'তকেও যেন উন্নতি দান করেন সেজন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি। আল্লাহ্ তা'লা উপসাগরীয় যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন এবং দ্বীন ইসলামের বিজয় সূচিত করুন।

(পাক্ষিক আহমদী-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১)

কর্মসূচি অনুযায়ী ৮ ফেব্রুয়ারি জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন জনাব চৌধুরী সাব্বির আহমদ এবং মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। এ ভাষণের পূর্বে হুযুর রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। তিনদিন ব্যাপী সম্মেলনে মোট ৫ টি অধিবেশনে ৩৩ জন বক্তা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন-

বর্তমান বিশ্বে পবিত্র কুরআনের প্রচার ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, রসুলে আকরাম মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বর্তমান যুগ, আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান, নামাযের গুরুত্ব, মজলিস আনসারুল্লাহ কি এবং কেন, ইসলাম ও মৌলিক মানবাধিকার, খিলাফতের মর্যাদা ও কল্যাণ, বিশ্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিকার, হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আই.)-এর তাহরীক, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ এর ফেৎনা হতে পরিত্রাণ, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আপত্তির খণ্ডন, শান্তি ও যুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা, বর্তমান সময়ের ঘটনাবলীর আলোকে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ, সীরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), আহমদীয়া যুব সংগঠন কি এবং কেন, লাজনা ইমাইল্লাহ কি এবং কেন, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, সন্তানের চরিত্র গঠন, কবুলিয়তে দোয়া, হযরত ইসা (আ.) এর নুযুলের তাৎপর্য, খাতামান্নাবিয়্যিন (সা.), ঐশী নির্দশনের কয়েকটি ঝলক, মালী কুরবানী এবং নেযামে ওসীয়্যত ইত্যাদি।

বক্তৃতায় যারা অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন- সর্বজনাব ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী, চৌধুরী সাব্বির আহমদ, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, আজিজুল হক, মওলানা বশীরুর রহমান, অধ্যাপক শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, খন্দকার মাহমুদুল হাসান, মওলানা ফিরোজ আলম, মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন, এডভোকেট ফরিদ উদ্দিন আহমদ, মওলানা আব্দুল আজীজ সাদেক, মওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, মওলানা সালেহ আহমদ, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ডা. আব্দুল আজিজ, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, অধ্যাপক আমীর হোসেন, ওবায়দুর রহমান ভূঞা, ভিজির আলী, মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, এ কে রেজাউল করীম, অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী এবং কাসেম আলী খান প্রমুখ। সমাপ্তি অধিবেশনে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ভাষণে জলসা সমাপ্ত হয়। এতে তিন হাজার জন উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯২

৭-৯ ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ জামা'তের ৬৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল আমীর জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলীর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন হয়। তিনি এক হৃদয়গ্রাহী উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। জলসা উপলক্ষ্যে হযরত আমিরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রেরিত পয়গাম পাঠ করে শুনানো হয়। উপস্থিত শ্রোতারা আবেগাপ্লুত হয়ে তা শ্রবণ করেন। সেই অমূল্য বাণীটি নিম্নরূপ-

পয়গাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের আমার প্রিয় সদস্যবৃন্দ! আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এটি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আপনাদের বার্ষিক জলসা কল্যাণমণ্ডিত ঐতিহ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে ঐ সকল কল্যাণ হতে বেশি বেশি অংশ দান করুন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ অত্যন্ত চৌকষ ও সাহসী এবং সব ধরণের বিরোধিতার তুফানে খোদা তা'লার উপর নির্ভরশীল জামা'ত। বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে খোদাতা'লা স্বীয় সাহায্য ও অদৃশ্যের নিদর্শন দেখিয়েছেন। প্রত্যেক বিরোধিতার সময় এটি ঈমানকে অত্যাধিক দৃঢ়তা দান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে নসিহত করেছেন যে, প্রজ্ঞা ও সৎ উপদেশ দ্বারা যেন দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজ করা হয়, ফলে আমলের মধ্যে যেন ঐশী শক্তির সঞ্চার হয়। আর তার প্রভাবে মানবমণ্ডলী আকৃষ্ট হয়। বিভিন্ন সময়ে আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিয়েছি এবং বর্তমানে আমার উপদেশ এই যে, দোয়ার মাধ্যমে ঐ সকল উপদেশগুলোর উপর আমল করুন এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে ঐ সমস্ত হেদায়াতের প্রতিটি দিক অবলম্বন করুন এবং দোয়া করুন। আল্লাহ্‌তা'লা এই জলসাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং উদ্দীপনার পরিবেশে খোদার হেফাযতে, খোদার স্মরণে এবং রসুলে করীম (সা.) এর উপর দরূদ পাঠের মাধমে এই দিনগুলোকে অতিবাহিত করুন। খোদা তা'লার হেফাযতে আপনারা ঘরে ফিরুন।

আল্লাহ্ আপনাদের সহায় হউন।

খাকসার

মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

(পাক্ষিক আহমদী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২)

.. *(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম।
খাকসার,
সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

‘এপ্রিল ফুলের’ বিষাদময় ইতিহাস অতঃপর আহমদীয়াতের মাধ্যমে স্পেনে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের মাধ্যমে সভ্যতার যে সোনালী অধ্যায় সূচিত হয়েছিল আরব উপদ্বীপে, ক্রমে ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। আফ্রিকার মরু প্রান্তর থেকে এশিয়ার প্রান্ত সীমা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপ, সর্বত্রই সেই আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো প্রবল বেগে। দূর হচ্ছিল এত দিনের জমে থাকা শোষন, দুঃশাসন, নির্যাতন, বঞ্চনা, বৈষম্যের করুণ ইতিহাস। শত শত বছরের বন্দী মানুষ এতদিনে মুক্তির স্বাদ পেল। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষ পেল তার স্বাধীনতা। অধিকার বঞ্চিত নারীরা পেল তার অধিকার। মানুষের এই অধিকার, মানুষের এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আলোর মশালবাহী মুসলমানরা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, আর দেশের পর দেশ তাদের করতলগত হয়েছে। না, আমি এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রিয় পাঠক, আমি আজ স্পেন বিজয়ের সেই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী এবং পরবর্তীতে ঈমান আমল থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে ‘এপ্রিল ফুলের’ মত যে করুণ পরিনতি সৃষ্টি হয়েছিল তা সংক্ষেপে এবং এরপরে আবার এ যুগের মামুর মিনাল্লাহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) (প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে স্পেনে ইসলামের বিজয় অভিযানের গল্প শোনাব।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। দেশে কোন ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। খ্রিষ্টধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বরদাস্ত করা হত না। ইহুদীদেরকে জোর করে খ্রিষ্টান বানানো হত। স্পেনের রাজা গথিক বংশীয় খ্রিষ্টান রডারিক অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তার অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অনেক প্রজা মুসলিম আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারা খলীফা ওয়ালিদের সেনাপতি মুসাকে নানাভাবে স্পেন জয় করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। এ ছাড়া সে সময় সিউটা দ্বীপের শাসক কাউন্ট জুলিয়ান, রাজা রডারিকের অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে মুসাকে স্পেন জয় করার জন্য আহ্বান জানান।

খলীফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে সেনাপতি মূসা-ইবনে নুসায়ের মূর সেনানায়ক তারিক ইবনে জিয়াদকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ৭০০০ (সাত হাজার) সৈন্যসহ স্পেন বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তারিক স্পেনের দক্ষিণ পূর্বে এক উচ্চভূমিতে অবতরণ করেন, তাঁর নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম হয় ‘জাবালুত-তারিক’ বা তারিকের পাহাড় (বর্তমানে জিব্রালটার)। এরপরে তারিক সেনাবাহিনীকে রনতরী গুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা বিস্মিত হয়ে জানতে চান, যদি আমরা যুদ্ধে হেরে যাই; তাহলে পালাবো কিভাবে? ঈমানের বলে বলিয়ান তারিক উত্তর দেন “আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমরা বিজয়ী হব অথবা শহীদ হব।” পালানোর পথ রুদ্ধ করতে তারিকের নির্দেশে জাহাজগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়। এরপরে তারিক সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা করে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং আলজিসিরাস প্রদেশে প্রবেশ করে সেখানকার প্রদেশপাল থিয়োডমিরকে পরাজিত পূর্বক রাজধানী টলেডোর দিকে যাত্রা শুরু করেন। রাজা রডারিক মুসলিম অভিযানের খবর পেয়ে সামন্ত রাজাগনের ও নিজের সহ সর্বমোট

১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে গোয়াডিলেট নদীর তীরে মেডিনা সিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। অপরদিকে মুসা আর মাত্র ৫০০০ (পাঁচ হাজার) সৈন্য তারিকের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা হয় সর্বমোট মাত্র ১২০০০ (বার হাজার)। এত অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তারিক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধে রাজা রডারিকের বিশাল বাহিনীকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পরাজিত রডারিক পলায়নকালে গোয়াডিলেট নদীর পানিতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন। মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এই অসম যুদ্ধে কেউ কি বিজয়ের কথা কল্পনা করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পাক কালাম কুরআন মজীদে বলেন,

"আর যে আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দলই বিজয়ী হবে।" *(সূরা আল মায়েদা: ৫৭)*

তারিক অতি অল্প সময়ে স্পেনের বেশির ভাগ এলাকা দখল করে নেন। এরপরে মূসার সাথে মিলিত হয়ে গোটা স্পেন এবং পর্তুগাল দখল করেন। এরূপে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করে ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে অশীতিপর মূসা যখন ফরাসী সীমান্তে পিরোনীজ পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হয়ে সমগ্র ইউরোপ জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সম্ভবত তারিক ও মূসার মধ্যে মনোমালিন্যের সংবাদ শ্রবণ করে খলীফা ওয়ালিদ তাদেরকে রাজধানীতে (দামেস্কে) ডেকে পাঠান। না হলে হয়ত ইউরোপের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হত।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় মধ্যযুগে ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তরা তাদের অন্যায় অধিকার ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হল। সমাজে সমতা, সু-বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হল। কৃষক জমির মালিকানা পেল, দাসেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ছাড়াও মুসলিম শাসনে স্পেনে যে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশীলন শুরু হয়, তা সমগ্র বিশ্বকে বিশেষ করে ইউরোপ মহাদেশকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোকের রাজ্যে নিয়ে যায় যা পরবর্তীকালে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা করে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক লেনপুল বলেন,

"(মুসলিম) মূরগণ প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা রাজ্য মধ্যযুগের একটা পরম বিস্ময়। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরতা, অজ্ঞতা ও দন্দ্ব কলহে নিমজ্জিত, এই রাজ্য তখন পাশ্চাত্যের সম্মুখে উজ্জল আলো বিকিরণকারী জ্ঞান ও সভ্যতার মশাল তুলে ধরেছিল।"

এক কথায় মুসলিম শাসনে স্পেনের অধিবাসিগণ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল।

শত শত বছর ধরে উন্নতির এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। তারপর ধীরে ধীরে মুসলিম শাসকগণ আল্লাহ্ এবং মহানবী (সা.)-এর কথা ভুলে যেয়ে বিলাসিতার সাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলে চরম নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয় তারা। শাসন কার্য পরিচালনার চেয়ে মদ, গান-বাজনা, নর্তকী ও রূপসী নারীরা তাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়ে উঠে। দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণে রাজ্যগুলি আস্তে আস্তে হাত ছাড়া হতে থাকে। অবশেষে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা মিলিতভাবে মুসলমানদের সর্বশেষ গ্রানাডা রাজ্য দখল করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হন, তবে তারা প্রস্তাব দেন; মুসলিম বাহিনী যদি অস্ত্র-সস্ত্রসহ মসজিদে মসজিদে আশ্রয় নিয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদেরকে প্রাণে রক্ষা করা হবে। তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মুসলিম বাহিনী, খ্রিষ্টান বাহিনীর এই অপমানজনক প্রস্তাবে সম্মত হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভুলে যাওয়া এই হতভাগারা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে পারে নি। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১ লা এপ্রিল খ্রিষ্টানদের যৌথবাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো খ্রিষ্টান বাহিনী ৭৮০ বছর পূর্বের তারিক বিন জিয়াদের কাছে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয় নির্বিচারে নিরস্ত্র মুসলিম নর নারী হত্যার মধ্য দিয়ে।

নিরস্ত্র মুসলমান নর নারীকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের দিনটাকে **'এপ্রিল ফুল'** হিসেবে পালন করে আসছে খ্রিষ্টান বিশ্ব। এরপরের ইতিহাস আরো করুণ। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, আর বাদ বাকী সমস্ত মুসলমানকে বিতাড়িত করা হয় স্পেন থেকে। মসজিদ গুলিকে ঘোড়া রাখার আস্তাবলে পরিণত করা হয়। এভাবে স্পেন থেকে মুসলমান ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় পন্থা গ্রহণ করা হয়।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এইভাবে একে একে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে ইসলামের শত্রুরা। তিন খোদার পূজারী ভয়াবহ দাজ্জাল বাহিনী (খ্রিষ্টান) সারা দুনিয়া ছেয়ে ফেলে। তারা সদর্পে ঘোষণা করল, পবিত্র কাবা শরীফে তারা ক্রুশের পতাকা উড্ডীন করবে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের খপ্পরে পড়ে ইসলাম থেকে বিদায় নিল। মর্ত্যলোক যেন ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত হল। আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইসলামই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম।" *(আলে ইমরান: ২০)*

মহান আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে পুনরায় সারা পৃথিবীতে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে প্রেরণ করেন। তাঁর পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি (আ.) মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ পূর্বক তাদের হারানো ঈমান ও আমল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা আহমদে মুস্তফা (সা.)-এর

পবিত্র 'আহমদ' নাম অনুসারে ১৮৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কায়েম করেন। তিনি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করলেন,

"সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যুবক হওয়ার পর সে যেমন মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না, তেমনি প্রগতির ধারায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে আবার খ্রিষ্ট ধর্মে ফিরে যাবে না। ইসলাম ধর্মই জগতে বিজয়ী হবে। এটাই আল্লাহ্ তা'লার বিধান"।

খ্রিষ্ট ধর্মের মূল ভিত্তি প্রায়শ্চিত্তবাদ ও যিশুর ঈশ্বরত্ব এই অসার বিশ্বাসের মূলে তিনি (আ.) কুঠারাঘাত হেনেছেন। তিনি (আ.) পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত, হাদিস, বাইবেলের বিভিন্ন বর্ণনা, বহু ভাষায় প্রকাশিত চিকিৎসা শাস্ত্রের সহস্রাধিক বই, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের লেখা অনেক গ্রন্থ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, শুধু মাত্র বনী ইসরাঈল জাতির জন্য আবির্ভূত হযরত ঈসা (আ.) প্যালেস্টাইনে ক্রুশীয় অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে নিস্কৃতি পেয়ে, নবীদের চিরন্তণ সুন্নত অনুযায়ী হিযরত করে আফগানিস্তান হয়ে কাশ্মীরে আগমন করেন। যেখানে আগে থেকেই বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা বসবাস করত। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই, "আর মরিয়মের পুত্র ও তার মাকে আমরা এক নিদর্শন বানিয়েছিলাম। আর আমরা তাদের দুজনকে (ক্রুশের মহাবিপদ থেকে) উদ্ধার করে নিরাপদ বসবাসযোগ্য ও ঝরণা বহুল এক উঁচু জায়গায় আশ্রয় দিয়েছিলাম।" *(সূরা আল মোমেনুন: ৫১)*

ভূ-স্বর্গ হিসেবে খ্যাত কাশ্মীরে বনী ইসরাঈল জাতির মাঝে মহান আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করে হযরত ঈসা (আ.) ১২০ বছর বয়সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। খানইয়ার স্ট্রীট, শ্রীনগর, কাশ্মীরে ইহুদী রীতি অনুযায়ী তাঁর কবর বিদ্যমান। (বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রণীত পুস্তক 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' (বাংলা অনুবাদ ভারত বর্ষে ঈসা [আ.] পড়ুন)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.), হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং কাশ্মীরে তাঁর কবর থাকার প্রমাণ দিয়ে, বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতির (খ্রিষ্টান) ধর্ম বিশ্বাসের কবর রচনা করেছেন। পাশাপাশি ইহুদীদের ভুল বিশ্বাসকে খণ্ডন করেছেন অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু, তাঁর সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ইহুদীরা সেই সত্য নবীকে না মেনে চরম অন্যায় ও অপরাধ করেছেন বলে তিনি (আ.) সাব্যস্ত করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এভাবে বর্তমানে প্রচলিত সব ধর্মবিশ্বাসকে, স্বস্ব ধর্মগ্রন্থ, যুক্তি ও দলীল, প্রচলিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে অসার এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। সেই সাথে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ, যুক্তি ও দলীল, দর্শন ও বিজ্ঞান, সর্বোপরী ঐশী সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেন যে, ইসলাম ধর্মই একমাত্র সত্য ও জীবন্ত ধর্ম যা মানুষকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

তিনি (আ.) জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন, "মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল ও শাফী (সুপারিশকারী) নেই।" *(কিশতিহে নূহ, পৃষ্ঠা-২৫)*

তিনি (আ.) ৮৮ খানা গ্রন্থ, প্রায় ৯০০০০ (নব্বই হাজার) চিঠি-পত্র, মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত অজস্র ওহী ইলহাম, বক্তৃতা, বিবৃতি ও অনুপম ব্যাবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অপরূপ, বিস্ময়কর সৌন্দর্য জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরেন। ইসলামের এই অপার, বিস্ময়কর গুণাবলী ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন জাতি ধর্মের সাধু ব্যক্তিগণ, তাঁর (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হতে শুরু করে। তাঁর (আ.) জীবদ্দশায়, তিনি (আ.) এক বিশাল কর্মতৎপর জামা'ত রেখে যান, যারা ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর জন্য সব সময় সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতেন। ১৯০৮ সালের ২৬ শে মে তাঁর (আ.) তিরোধানের পরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র ওয়াদা এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ২৭ শে মে ১৯০৮ সালে সেই প্রতিশ্রুত ঐশী খেলাফত কায়েম হয়।

ঐশী খেলাফতের অধীনে যুক্তি ও দলীল, প্রেম ও ভালবাসার মাধ্যমে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও মানুষের অন্তর সমূহকে ইসলামের জন্য জয় করার এই বিজয়াভিযান অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, এশিয়া, ইউরোপ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত মসজিদ, মিশন হাউস (শক্তিশালী ইসলাম প্রচার কেন্দ্র), হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৫৬ সালের দিকে বিখ্যাত বুযূর্গ ব্যক্তিত্ব মওলানা করম ইলাহী জাফরকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের জন্য স্পেন প্রেরণ করেন। তখনকার দিনে তাঁর এই যাত্রা সহজ ছিল না এবং সেখানে বাইরে থেকে কোন অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হত না। মওলানা করম ইলাহী জাফর সাহেব ঠেলাগাড়িতে করে আতর-সুগন্ধির ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর বাকী অর্থ দিয়ে স্পেনিশ ভাষায় বই পুস্তক ছাপিয়ে বিনামূল্যে খ্রিষ্টান ও অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তাঁর তবলীগ করার পদ্ধতি ছিল এরূপ-

তাঁর ঠেলাগাড়ির একপাশে থাকত বই-পুস্তক অন্যপাশে আতর-সুগন্ধির শিশি সরঞ্জাম ইত্যাদি। তিনি ঠেলাগাড়ি ঠেলে ঠেলে এক স্থানে যেয়ে থামতেন। লোকজন জড়ো তাঁকে ঘিরে ধরত। তিনি

প্রথমে আতর-সুগন্ধী স্প্রে করতেন। সৌরভ সুবাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি বলতেন, এই সুগন্ধ-সৌরভ কিছুক্ষণ পরে বাতাসে মিলিয় যাবে। কিন্তু আমার কাছে আরো এক প্রকার সুগন্ধ-সৌরভ আছে যা কখনো শেষ হবে না বাতাসেও মিলিয়ে যাবে না। সারা জীবন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও তা তোমাদেরকে সুবাসিত রাখবে। এই বলে তিনি তখন স্পেনিশ ভাষার ইসলামী বই পুস্তক তাদের মধ্যে বিতরণ করতেন। কখনো সাড়া পেতেন, কখনো প্রচণ্ড বিরোধিতা হত। ঠেলাগাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করা হত। কখনো পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। খোদার খাতিরে অম্লান বদনে তিনি সব সহ্য করে তবলীগ অব্যাহত রাখেন। তাঁর এই কুরবানীর ফলে মানুষের অন্তরগুলি আলোকিত হতে শুরু করে। স্পেনে একটা জামা'ত কায়েম হয়। হযরত হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ৯ অক্টোবর ১৯৮০ সালে স্পেনের পেড্রোয়াবাদ নামক স্থানে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে" তাঁর এই অমর বাণী ঘোষণা করেন যা একান্তই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। তাঁর (রাহে.) প্রেম ভালোবাসাপূর্ণ বাণীতে মুগ্ধ হয়ে স্পেনের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে এই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে, ইতিপূর্বে এদেশে তরবারীর মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, আমরা তরবারী দ্বারাই তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছি (তাদের একথা মিথ্যা, অতীতেও ঈমান আমলের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়েছিল)। কিন্তু এখন তারা যে ভালোবাসার শক্তি দিয়ে স্পেনবাসীর অন্তরকে জয় করে নিচ্ছে, তাকে মোকাবিলা করার মত সক্ষমতা কি স্পেনবাসীর আছে ?

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে ঐতিহাসিক সেই **'মসজিদ বাশারত'** উদ্বোধন করেন। এভাবে দীর্ঘ প্রায় ৭৫০ বছর পরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে স্পেনে আবার ইসলামের আবাদ শুরু হয়। ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলার নিষ্ঠুর মুসলিম নিধনযজ্ঞের মধ্য দিয়ে যে কালরাত্রির শুরু হয়েছিল, ঐশী নেত্রীত্বাধীন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রেম ভালোবাসার মাধ্যমে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের অন্তর জয় করার মধ্য দিয়ে আলোঝলমল নুতন দিনের সূচনা হয়।

সারা দুনিয়ায় ঐশী খেলাফতের অধীনে (বর্তমানে পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)-এর নেতৃত্বে) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পরিচালিত ইসলামের এই বিজয় অভিযান, যা যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে, প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে, দোয়া ও আল্লাহ্‌র সাহায্যের মাধ্যমে সাধিত হচ্ছে তা মোকাবিলা করার মত শক্তি পৃথিবীতে কারো নেই, আলহামদুলিল্লাহ্।

Special Attention from Central Bangla Desk

Please note that our email has now been changed therefore from now on you are requested to send your DOA letters to the following email address: **doa@bangladesk.org**

Feroz Alam
In-charge, Bangla Desk

স্মৃতিময় ঘটনাবহুল কিছু কথা

প্রয়াত আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী

[আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা-র শত বার্ষিকী (১৯২০-২০২০) উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় কী লেখা দেওয়া যায় তাই তিনি খাকসারকে পাশে বসিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের কিছু কিছু ঘটনা বলেন যার শ্রুতি লেখা (মৃত্যুর ২ সপ্তাহ পূর্বে দ্রুত শেষ করে বলেন, আপাতত এইটুকুই থাক।) -মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন]

(১ম কিস্তি)

আমার জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অন্তর্গত সরাইল উপজেলা সদরে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে, শিক্ষা সনদে জন্ম তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ১২ অক্টোবর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ। আমার পিতার নাম মীর উসমান আলী, মাতার নাম সৈয়্যদা আমাতুর রহমান, দাদা জনাব মীর সেকান্দার আলী, আর দাদী জুবেদা খাতুন। শৈশবে সরাইলে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনার পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর চট্টগ্রাম চলে যাই। সেখানে চকবাজার আহমদীয়া মসজিদ সংলগ্ন জনাব গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া) সাহেবের বাড়ীতে অবস্থান করি। প্রথমে কলেজিয়েট স্কুলে ও মুসলিম হাইস্কুল পরে কাজেম আলী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি এবং ১৯৬৪ সালে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। এখানে জামা'তের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও ফালু মিয়া সাহেবের তবলীগি কর্যক্রম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি। ছাত্র জীবনে ভাল ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম। ভাল প্লেয়ার হওয়ার সুবাদে ছাত্র মহলে আমার খুব কদর ছিল। তখন আমার আর্থিক অনটনও ছিল। আমার সহপাঠিরা অনেক সময় চাঁদা তুলে আমাকে সাহায্য করত। আমার বড় ভাই জনাব মীর মোহাম্মদ শফি ঐ সময় চট্টগ্রামে মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকুরী করতেন। আমি কিছুদিন তার বাসায় অবস্থান করি। এক পর্যায়ে ছাত্র জীবনেই খাতুনগঞ্জে ব্যবসা শেখার সুযোগ গ্রহণ করি।

ভাল স্পোর্টসম্যান হওয়ায় অনেকের আমার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বড় ভাই শফি সাহেবের ব্যাংকের উপরস্ত অফিসার আমাকে একটি হারকিউলিস সাইকেল উপহার দেন। এ সাইকেল নিয়ে আমি চট্টগ্রাম জামা'ত ও খোদ্দামের কাজ করার সুযোগ পাই।

১৯৬৩ সালে আমি ঢাকায় চলে আসি। প্রথমদিকে গুলিস্তানের তদানিন্তন ফুলবাড়িয়া রেলওয়ে কোয়ার্টারে আমার খালুর বাসায় অবস্থান করি। সেখান থেকে রেল লাইন ধরে বকশী বাজার আঞ্জুমানে এসে নামায ও জামা'তী কাজে অংশ নিতাম।

আর্থিক দৈন্যতার কারণে এক পর্যায়ে রশিদ আহমদ বুলবুল (তৎকালীন আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের বড় ছেলে)-এর সাইনবোর্ডের দোকানে ২ টাকা রোজে কাজ করা শুরু করি। বেশ কিছুদিন কাজ করার পর নীতিগত কারণে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে মাসিক ৬০ টাকা বেতনের চাকুরীটা ছেড়ে দেই। উল্লেখ্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে উপরোক্ত স্বল্প আয় থেকেও চাঁদা দিতাম। আল্লাহ্‌র কী শান! ঐ দিনই কোকা-কোলার পাবলিসিটি অফিসার আমাকে ডেকে নিয়ে চাকুরী দেন মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে। তখন ছিল মাসের মাঝামাঝি। কাজে যোগ দিয়ে দেখতে পাই সেখানে পূর্ব থেকেই দু'জন পাঞ্জাবি আর্টিস্ট ও কন্ট্রাকটার কাজ করে। আমাদের একই ধরনের কাজে তিন জনের মধ্যে শীতল প্রতিযোগিতা চলে। কর্তৃপক্ষ আমার কাজে সন্তুষ্ট হয় এবং পরবর্তী মাস থেকে আমার মাসিক বেতন ২৫০ টাকায় উন্নীত করে দেন। আমি মনে করি, এটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানির ফল।

এ কাজের কন্ট্রাকটার পাঞ্জাবী ২ জন পেইন্টার পাকিস্তানে ফেরত যাবার প্রাক্কালে কোকা-কোলা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ 'তাবানী সাহেবের' সামনে আমার হাত টেনে নিয়ে বলে, চল তোমাকে লাহোর নিয়ে যাব আর তাবানি সাহেবকে বললো আপনি পেইন্টার পাবেন কিন্তু এর মত সৎ ও ঈমানদার পাবেন না। এ কথা শুনে তাবানী সাহেব তাদের অনুরোধ ও সুপারিশে কাজের কন্ট্রাক্ট আমাকে দিয়ে যায়। আর তখন থেকে ঐ কাজের কন্ট্রাক্ট দিয়ে তাদের ফ্যাক্টরীতে আমার নিজের প্রথম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর্টিকোর যাত্রা শুরু। কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও ছিলাম, এ কাজ করতে অনেক পুঁজির প্রয়োজন, কিন্তু এত টাকা পাব কোথায়? বিষয়টি তাবানী সাহেবকে জানাতেই অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি বিশ হাজার টাকা

আমাকে অগ্রিম দেন। ভাবি! আল্লাহ্ কী না পারেন। কোকা-কোলা ফ্যাক্টরীতে কাজের পাশাপাশি মহাখালী বাজারে একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে আর্টিকোর অফিস স্থাপন করি। আল্লাহ্‌র রাস্তায় মালি কুরবানির বরকতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে উন্নতির পর উন্নতি দিতে থাকেন। এর ফলে বনানীর চেয়ারম্যান বাড়ী মেইন রাস্তা সংলগ্ন বৃহত্তর পরিসরে এমিকন নামে নতুন আঙ্গিকে ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটে।

বিবাহ প্রসঙ্গ

১৯৬৩ সনের অক্টোবর মাসে নাটোরের জনাব আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী সাহেবের ২য় কন্যা মরিয়মের সাথে আমার বিয়ে হয়। উল্লেখ্য, কন্যার পিতা এস্তেখারা করে ঐশী ইংগিত পেয়ে আমার সাথে তার মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দেন। এবিষয়ে কিছু কথা না বলে পারছি না। তখন কেন্দ্র থেকে লাজনার একটি প্রতিনিধি দল ব্রাহ্মণবাড়িয়া সফরে গিয়ে এক পর্যায়ে সরাইল মীর বাড়ীতে যান। ঐ টীমে মরহুম আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা আমাতুর রহমান কিশওয়ার সাহেবাও ছিলেন। সেখানে জনাব মীর উসমান আলী সাহেবের ঘরে আমার ছবি দেখে তিনি আমার মাকে বলেন, এ ছেলেকে আমি আমার মেয়ের জন্য চাই। অর্থাৎ মরিয়মকে তিনি নিজের মেয়ের মতই মনে করতেন ও অনেক আদর করতেন আর অনেক সময় নিজের কাছে রাখতেন। আমার আম্মা, সৈয়দা আমাতুর রহমান (একই নামের কারণে উভয়ে সই পেতেছিলেন) তার সই-এর কথায় তাৎক্ষনিকভাবে রাজী হয়ে যান। এরপর কনের বড় ভগ্নিপতি জনাব মকবুল আহমদ খান সাহেবের বাসায় পাত্রী দেখার ব্যবস্থা করা হয়। আমি দেখি পাত্রী আমার চেয়ে কমপক্ষে ১২ ইঞ্চি খাটো তদুপরি আমি আমার মায়ের কথার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আর কোন দ্বিরুক্তি করি নি। বিয়ের পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ১ কন্যা ও ২ পুত্র সন্তান দান করেছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে আমার ৩ সন্তানই আমার মত লম্বাটে হয়েছে, তাদের মায়ের মত খাটো হয় নি। আমরা প্রায় ৫৮ বছর ধরে সুমধুর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

এখন আমরা কী দেখছি! বর্তমান ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা, তাসাদ্দক সাহেবকে এক পাত্রের মামা তার ভাগ্নের জন্য শর্ত জুড়ে দিয়ে পাত্রী চাচ্ছে, পাত্র যেহেতু লম্বায় ৫'-১০ ইঞ্চি তাই পাত্রী কমপক্ষে ৫'-৬ ইঞ্চি আর সুন্দরী তো হতেই হবে। এরপর একের পর এক মেয়ে দেখেই চলেছে। মনে হয় এদের পছন্দের পাত্রী বাংলাদেশেই নাই। আমি আহমদী যুবকদের স্মরণ করাতে চাই, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর অমুল্য বাণী– **"যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন সম্ভব নয়।"**

১৯৬৩ সাল– এ বছরটি ছিল আমার জীবনে খুবই বৈচিত্রময়। আমি পূর্বেই বলেছি ১৯৬৩ সালে আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে আসি আর বিয়েও হয় এবছর। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খোদ্দামের ইজতেমার পর জলসা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে উগ্রবাদীদের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় আহমদীরা। তারুয়ার জনাব আব্দুর রহীম ও মানিকগঞ্জের জনাব উসমান গনী সাহেব শহীদ হন ঐ হামলায়। আমি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। আমি মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলাম। তখন একটি পাথর আমার মাথায় আঘাত করে, মাথা থেকে রক্ত ঝরে। আমি আহত হই, কিন্তু ডিউটি ছেড়ে দেই নি। মনে হয় আল্লাহ্ তা'লা এর বরকতে আমাকে তার জামা'তের খেদমত করার সুযোগ বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আগেই বলেছি, মহাখালী আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তাই ঐ এলাকাতে একটি টিনশেড বাসা ভাড়া নিয়ে অবস্থান করি। তখন মহাখালী, গুলশান-বনানী আর ক্যান্টেনমেন্ট নিয়ে ঢাকা জামা'তের মহাখালী হালকা। এ হালকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহতরম মির্যা জাফর আহমদ সাহেব [হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর চাচাত ভাই] আর আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল জেনারেল সেক্রেটারীর। তখন নাখালপাড়ার বাসিন্দা চান মিয়া, তার বন্ধু গনী মিয়া ও মান্নান ইলেকট্রিশিয়ান আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর্টিকোতে বসে জামা'তী আলোচনা ও তবলীগের কাজ করতেন। আমার কাঁধে ঝোলানো একটা কাপড়ের ব্যাগে তবলীগি পুস্তিকা আর চাঁদার রশীদ বই থাকত। মূলতঃ আমি ১৯৬৩ সাল থেকে মুহাচ্ছিলের (চাঁদা আদায়কারী) দায়িত্ব পালন করে আসছি যা এখনও আমার পিছু ছাড়ছে না। মনে পড়ে দুর্গারামপুরের মৌলবি আফজাল হোসেনের (আশকোনা হালকার সদস্য তোফজ্জল হোসেনের দাদা) অভিনব তবলীগি কলাকৌশলের কথা। তিনি নাপিতের বেশে মহাখালী এলাকায় তবলীগের কাজ করতেন। এক পর্যায়ে তৎকালীন বনানী চেয়াম্যানবাড়ীর চেয়ারম্যান তার তবলীগে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, পরে সামাজিকতা ও রাজনীতির কারণে তিনি আহমদীয়াত ধরে রাখতে পারেন নি।

এই হালকার বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন পাঞ্জাবী বড় বড় ব্যবসায়ী আর কিছু আর্মি অফিসার। আমার স্মৃতিতে বেশি ভাসে কর্নেল সাঈদ সাহেবের কথা। তিনি ছিলেন সাধারণ সিপাই। তিনি একবার একান্তে আমাকে তার কিছু ঘটনা শুনান। জনৈক সাহাবী তাকে বলেন, 'সাঈদ! তুম মুসী কীউ না বানো' তুমি যে প্রতিমাসে এক-দেড় টাকা চাঁদা দাও ওসীয়্যত করলে মাত্র কয়েক পয়সা বাড়তি দিতে হবে। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুবারক তাহরীক ওসীয়্যত করলে দেখবে আল্লাহ্ তোমাকে অনেক বরকত দান করবেন। সাঈদ সাহেব বলেন, বুযুর্গ সাহাবীর নসিহতের ওপর আমল করে আমি ওসীয়্যত করি। তিনি বলেন, ওসীয়্যত করার অল্প কিছু দিন পর আর্মিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক ও তার উপরের শিক্ষিতদের অফিসার র‍্যাংকে পদোন্নতির সুপারিশ চাওয়া হয়। তখন আমার

পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট হয়ে আমার উপরস্ত কর্মকর্তা আমার নামও অফিসার র‌্যাংকের জন্য সুপারিশ করেন। এমনকি তার সুপারিশে আমার অফিসার র‌্যাংকে পদোন্নতিও ঘটে। পরে ঐ অফিসার কর্নেল সাঈদ সাহেবকে বলেছিলেন, শুন! আমি তোমার নাম সুপারিশের পর জানতে পারলাম তুমি উচ্চমাধ্যমিক পাশ নও, মাত্র এন্ট্রান্স পাশ, তখন আমি খুবই দুঃচিন্তায় পড়ে গেলাম, এটা আমি কী করলাম! পরে তোমার কর্মদক্ষতার কারণে তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতার যে ঘাটতি ছিল তা সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় আর প্রমাণিত হয়, আমার সুপারিশ করাটা সঠিক ছিল। কর্নেল সাঈদ বলেন, মীর সাহেব! এখন আমার বেতন অনেক বেড়েছে আর এটা ঐ সাহাবী যিনি আমাকে ওসীয়্যত করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারই জ্বলন্ত নির্দশন। তাই আমি আমার উপার্জনশীল আহমদী ভাই-বোনদের বলতে চাই, আমরা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে ঈমানের বহু পরীক্ষা দিচ্ছি অথচ তাঁর (আ.)-এর মুবারক তাহরীক ওসীয়্যতের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকছি। চলুন! আর দেরী নয়, এখনি ওসীয়্যতে শামিল হয়ে বরকতমণ্ডিত হই। আল্লাহ্‌র ফযলে আমি একজন ওসীয়্যতকারী। ওসীয়্যতের কল্যাণ ও বরকতের আমিও একজন বাস্তব সাক্ষী।

আপনারা জানেন মহাখালী থেকে বকশীবাজার আঞ্জুমান কত দূর। প্রতি সপ্তাহে সাইকেলে করে বকশীবাজার এসে আদায়কৃত চাঁদার টাকা জমা দিয়ে যেতাম। এখন দেখি আল্লাহ্ তা'লা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে দিয়েছেন, আহমদীদের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে অথচ আমরা জামা'তের কাজে যথাসময় কর্মী পাই না। আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, সচ্ছলতাই কী তাহলে আমাদের জন্য কাল হল, আমরা পরীক্ষায় পড়ছি না তো? ৬৩ থেকে একাত্তর পর্যন্ত মাতৃভূমির জন্য অনেক সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধ, অনেক ত্যাগের পর আমরা স্বপ্নের সোনার বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশ লাভ করলাম। মনেপ্রাণে স্বাধীনতার এক অকৃত্রিম স্বাধ ও আনন্দ-অনুভূতি যা বলে বুঝাবার নয়। মাতৃভূমি পেল নতুন ঠিকানা লাল সবুজের মনোরম পতাকা। কিন্তু ধর্ম! সেতো কোন বাধন মানে না, এর তো কোন সীমানা প্রাচীর নেই, নেই কোন জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণবৈষম্য। স্বাধীনতার আগে পূর্বপাকিস্তানে অনেক ধনাঢ্য আহমদী ছিলেন, যারা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। বিশেষ করে আমার গুলশান, মহাখালী হালকার সদস্যদের সিংহভাগই ছিল পাঞ্জাবী। স্বাধীনতাত্তোর সময় তাদের সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। ফলে এ হালকা প্রায় সদস্য শূন্য হয়ে পড়ে। আর্থিক কুরবানির লোক সংখ্যা তথা চাঁদাদাতার সংখ্যা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ আহমদীয়া জামা'তের তদানিন্তন আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নিকট বাংলাদেশ আহমদীয়া জামা'তের দৈন্যতার কথা উল্লেখ করে দোয়ার আবেদন করলে যুগ-খলীফা নসীহতমুলক পত্রে বলেন, "বাংলাদেশের আহমদীদেরকে জানিয়ে দিন তারা যদি আর্থিক দৈন্যতা কাটিয়ে সম্পদশালী হতে চায়, তারা যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় সঠিক নিয়মে আর্থিক কুরবানি করে।" আমি যেহেতু মুহাচ্ছিল বা চাঁদা আদায়কারী ছিলাম, আমি হুযুরের বার্তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখেছি এবং এখনো তা চলমান। আর আপনারা যারা আমার এ প্রবন্ধ পাঠ করছেন, আশা করি আপনারাও এ কথার বাস্তব সাক্ষী। এবিষয়ে আরো অনেক কথা বলা যেত কিন্তু এ পর্যায়ে তবলীগের নতুন ধারার কিছু কথা তুলে ধরা সমীচীন মনে করি।

একটি বিশেষ ঘটনা বলছি, কিউট কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব মাহতাব উদ্দিন সাহেব আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং চাচা সম্বোধন করত। তার এক চাচা বিমান বাহিনীতে চাকুরীকালে আমার সাথে সম্পর্ক এবং পরবর্তীতে তিনি অবসর গ্রহণের পর মহাখালীতে আমার প্রতিষ্ঠানের কাছেই একটি সাইকেলের দোকান করেন। নিয়মিত দেখা সাক্ষাতে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সে সুবাদেই মাহতাব সাহেব আমাকে চাচা বলতেন। তাদের পিতা জীবিত নেই। তাই তাদের ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য হলে আমাকে ডেকে নিত তাদের বাসায় আর আমার দেয়া উপদেশ বা ফয়সালা সবাই মানত। প্রথমবার যখন তার বাসায় যাই– মাহতাব সাহেব পাশের কক্ষে বসা তার মাকে আমার পরিচয় দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলে যে, আমি কাদিয়ানী-অমুসলিম। এ কথা শুনামাত্র তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, চট্টগ্রামের কাউকে চিনি কী না! তখন আমি গোলাম আহমদ খান (ফালু মিয়া) সাহেবের পরিচয় দিয়ে বলি তিনি আমাদের মামা অর্থাৎ আমার চাচী, মীর মোবাশ্বের আলী সাহেবের আম্মার ভাই। এ কথা বলতেই তিনি তার ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, জানো তুমি কী বলছ! তারা মুসলমান না হলে বাংলাদেশে কোন মুসলমান নেই। তোমার নানা যখন চট্টগ্রামে চাকুরী করতেন আমরা তখন ফালু মিয়া খান সাহেবের বাসার পাশেই ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। ভোরবেলা ঐ বাড়ী থেকে কুরআন তিলাওয়াতের কণ্ঠ ভেসে আসত। আমি গিয়ে দেখেছি মহল্লার মেয়েরাও ঐ বাসায় ফালু মিয়া সাহেবের বোন, তার চাচী– বেগম আপার কাছে কুরআন শিখত আর আমিও অংশ নিতাম। খবরদার! আর কোন দিন তাদের হেয় করে কথা বলবে না। তারা আমাদের চেয়েও ভাল মুসলমান। যাইহোক, আমি যাতে মাহতাব সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বাসায় মাঝে মধ্যে যাই তাই তারা আমাকে একটি গাড়ি (নামমাত্র দামে) প্রেজেন্ট করে। জামা'তের তখনও কোন গাড়ির বহর ছিল না। আমরা তখন এ গাড়ি নিয়ে তবলীগের কাজে বিভিন্ন জায়গায় সফর করেছি।

৩ আর্টিস্টের তবলীগি কর্মকাণ্ড

শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়ার ফাঁকে আঁকা-ঝোকার প্রতি ঝোঁক ছিল। তাইতো কর্মজীবনের শুরুতেই সাইনবোর্ডের দোকানে আর্টিস্ট হিসাবেই যোগ দেই। যাকে বলে এ্যামেচার আর্টিস্ট বা পেইন্টার। ১৯৭৫ সালে মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব বয়আত করার পর, তার সাথে পরিচয় ঘটে আর জানতে পারি সে যার তবলীগে বয়আত নেয় তার নাম আব্দুল জাব্বার, এরা উভয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারু ও কারুকলা কলেজ থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী আর্টিস্ট। তখন থেকে আমাদের ৩ জনের মধ্যে বিশেষ ধরনের ত্রিভুজ বন্ধন সৃষ্টি হয়। আমরা ৩ জনে পরামর্শ করি, চলেন! আমরা আর্টিস্টিক কায়দায় তবলীগ করি। আগেই বলেছি, আমি ঢাকা জামা'তের মহাখালী হালকার সাথে সম্পৃক্ত। তাসাদ্দক হোসেন সাহেব বয়আতের পরের বছর থেকেই খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল আর আব্দুল জাব্বার সাহেব ধীরস্থির স্বভাবের এক জন নিরবকর্মী। তাসাদ্দক সাহেব চাকুরী করতেন বিজ্ঞাপনী সংস্থায় আর জাব্বার সাহেব ছিলেন চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক। এ দুই শিল্পীর বয়আত গ্রহণের ঘটনা হয়ত ভিন্ন কোন প্রবন্ধে এ স্মরণিকাতেই থাকবে তাই আমি সেবিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের নতুন ভবন নির্মাণের পূর্বে অযুখানার পাশে একটা দেয়াল ছিল। জাব্বার সাহেব সেই দেয়ালে সূরা আত্ তাক্‌ভীরের আলোকে ও দাজ্জালের গাধার কথা তার সুনিপুন তুলিতে এঁকেছিলেন, যা আঞ্জুমানে প্রবেশ করা মাত্রই সবার দৃষ্টি কাড়ত। আর তাসাদ্দক এক সময় প্রিন্টিং ব্যবসা শুরু করেন, তখন তিনি বিভিন্ন ছাপাকাজের ফাঁকে ছোট ছোট কাগজে 'ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভুত হয়েছেন' এ কথার নিচে যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে ছাপানো হাজার হাজার সংখ্যায় বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, আমরা যখন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জামা'তে সফরে যেতাম, তখন রাস্তায় বিভিন্ন লোকালয়ে বিতরণ করতে করতে রাস্তা অতিক্রম করতাম। ঐসময় বিভিন্ন স্থান থেকে ঐ চিরকুটের সূত্রধরে বিস্তারিত জানতে কেন্দ্রে অনেক চিঠিপত্র আসত, উত্তর পেয়ে অনেকে বয়আতও করেছে। আমরা ৩ আর্টিষ্ট মিলে বন্ধু মহলে তবলীগের সুযোগও পেয়েছি। প্রথমে আমরা গুলিস্তান সংলগ্ন 'ক্যাফে ঢাকা' নামক হোটেলে তবলীগি সভার আয়োজন করি। মারকজ থেকে আগত মওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন ও মওলানা শফী সাহেব তাতে উপস্থিত ছিলেন। ৮০ জনের মত অ-আহমদী মেহমানের মধ্যে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস. এম. মোবাইদুল ইসলাম ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি নৈশভোজের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। হোটেলের মালিক ছিলেন সদ্য প্রয়াত মাহবুব হোসেন ও আসাদুজ্জামান। আমাদের আর্টিস্টিক কায়দার এ কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালিন খোদ্দামের সদর আব্দুল হাদীও খুশি মনে সম্পৃক্ত হয়। এরপরের বছর হাতিরপুল এলাকায় তার এক বন্ধুর চায়নীজ হোটেলে একটি তবলীগি সভার আয়োজন করি। এবারে সত্তরের অধিক অ-আহমদী মেহমান ছিল। যারা সবাই তাসাদ্দক ও আমার বন্ধুবান্ধব ছিল। জামালপুর জেলার দিগাপাইত কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। মারকযের মেহমান মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও পরে অ-আহমদী মেহমানদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেন। সভা শেষে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা লালমাটিয়া, মিরপুর রোডে মিড নাইট সান চাইনীজ রেষ্টুরেন্টে আরো একটি তবলিগী সভার আয়োজন করি। এ সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন মরকজ থেকে আগত মওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেব। যতদূর মনে পড়ে বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। এ সভার বিশেষ আর্কষণ ছিল তাসাদ্দক সাহেবের বিশেষ বন্ধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চরমপত্র পাঠক এম. আর. আকতার মুকুল এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান সাহেবের উপস্থিতি। বেশ কিছু ব্যবসায়ীও সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে মাহবুবুর রহমান সাহেব তার জাপান সফরকালে সে জাপানের একটি জাতীয় পত্রিকা উপস্থাপন করে বলেন যে, দেখুন! জাপানের পত্রিকায় আপনাদের খবর ছেপেছে যা আপনাদের দেখানোর জন্য আমি নিয়ে এসেছি। ইতোঃমধ্যে এম. আর. আক্তার মুকুল সাহেব আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমার চাদরে ঢেকে রাখুন। তিনি আহমদীয়া জামা'তের সমর্থনে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত ৩ টি তবলীগি সভার ব্যয়ভার আমি ও তাসাদ্দক ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নির্বাহ করেছি। এটি নিছক আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, আলহামদুলিল্লাহ্।

ঢাকার বাইরে বিশেষ তবলীগি অনুষ্ঠান

এরও আগে ১৯৮৬ সালের কথা। তখন তাসাদ্দক সাহেবের তবলীগে সালাম সাহেব নামের সরিষাবাড়ীর একজন বয়আত করে। তিনি বঙ্গবন্ধুর কেবিনেটের স্থানীয় সংসদ সদস্য মালেক সাহেবের ভাতিজা। এ কারণে সরিষাবাড়ীতে তার বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সাময়িক আর্থিক সংকটে পড়ায় কিছুদিন আমার প্রতিষ্ঠান এমিকনে কাজের সুযোগ করে দেই। তাকে কেন্দ্র করে আমরা ৩ আর্টিস্ট মিলে নতুন পরিকল্পনা করি। সরিষাবাড়ী জামা'তে শুরু থেকেই খুব বিরোধিতা ছিল। সরিষাবাড়ীতে একটি আলিয়া মাদরাসা ছাড়াও ৩ টি কলেজ, ৩ টি হাই স্কুল রয়েছে। কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সাথে তাসাদ্দক সাহেবের সক্ষতা ছিল, সেই সুবাদে তার পরামর্শ হল মাদ্রাসাসহ স্থানীয় স্কুল কলেজের কৃতি ছাত্রদের আমরা পুরুস্কৃত করব। আর যেদিন পুরস্কার হস্তান্তর করব সেদিন উপজেলা মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। আমি বললাম বুদ্ধিটা

মন্দ নয়। তোমরা এগিয়ে যাও! আমি এমিকন থেকে পুরস্কারের জন্য ক্রেস্ট বানিয়ে দিব।

তাসাদ্দক, জাব্বার আর নও-আহমদী সালাম সাহেব কালবিলম্ব না করে সরিষাবাড়ী উপজেলা সদরে গিয়ে প্রথমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি. কে. দেবনাথ ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাহেবের নিকট স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দ্যোগের কথা জানালে তারা প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করে এবং তারা তাদের পক্ষ থেকে সহযোগিতারও আশ্বাস দেয়। তাসাদ্দক ছিল খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েম ইসলাহ ও ইরশাদ। সে তার নাম পদবী উল্লেখ করেই সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা চেয়ে পত্র দেয় এবং আশানুরূপ সাড়া মিলে। মাদরাসা ছাড়া সরিষাবাড়ী উপজেলা সদরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা কেন্দ্রে জমা হয়। এটাকে আমরা সূবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। আমরা ৩ আর্টিষ্ট ভাবি! পুরস্কার বিতরণের দিনে কী প্রোগ্রাম করা যায়। এরই মাঝে তাসাদ্দক বললো, বিভিন্ন ধর্মে আখেরী যামানা (কলিযুগ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ও ইমাম মাহদীর (কলকী অবতারের) আবির্ভাব। ওর মনে হয়েছে ইউ.এন.ও. যেহেতু হিন্দু তাই এটা তার মনোপুত হবে। আমাদের মাথায় ছিল আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবিষয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখতে পারবেন। সামনে ছিল ১লা মে'র ছুটি, তখন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। আমরা ঠিক করলাম স্থানীয় প্রশাসনের সাথে প্রথমে দিন-তারিখ ও উপরোক্ত বিষয়ে সেমিনার ও উপজেলা মিলনায়তনের বুকিং-এর বিষয় নিশ্চিত হয়ে দাওয়াত পত্র বিতরণ করবো। ওরা ৩ জন উপরোক্ত প্রস্তাব নিয়ে ইউ.এন.ও.-এর কাছে দেখা করলে তিনি অত্যান্ত খুশী মনে সম্মতি দান করেন। এসব নিশ্চিত হওয়ার পর তারা তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান মৌলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের সাথে দেখা করে তাকে প্রধান অতিথি হওয়ার প্রস্তাব দেয়। তার সাথেও তাসাদ্দক ও সালাম সাহেবের সুসম্পর্ক থাকায় কিছু বুঝে উঠার আগেই সম্মতি দিয়ে দেয়। এরপর সরিষাবাড়ী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল আলীম উদ্দীন মণ্ডল সাহেবকে সভাপতির প্রস্তাব দিলে তিনিও সাদরে রাজী হয়ে যান আর ইউ. এন. ও. সাহেবকে বিশেষ অতিথির কথা বললে তিনিও সম্মতি দেন। সব কিছু পাকাপোক্ত করে সভাপতি ও অতিথি বৃন্দের নাম উল্লেখ করে আমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে নিয়ে ৩ জন আবার এলাকায় চলে যায় এবং সকল প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা, শিক্ষক ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমন্ত্রণ পৌছানো হয়। একমাত্র মাদরাসা ছাড়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐ অনুষ্ঠানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের এক দিন পূর্বে মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী উপজেলা চেয়ারম্যানের কাছে দাবী জানায়, এ অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। তাদের কথা তাসাদ্দক এ এলাকায় কাদিয়ানী বিস্তারের পায়তারা করছে, এ সেমিনার কিছুতেই হতে দেয়া যাবে না। আমাদের পক্ষে সালাম সাহেবও তার পক্ষের প্রভাবশালী লোকদেরকে কাজে লাগায়। কেন্দ্র থেকে আমি, আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মুস্তফা আলী, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল হাদী, মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন আগের দিন বিকালেই সরিষাবাড়ী উপজেলার নিকটবর্তী তাসাদ্দক সাহেবের বাড়ীতে পৌছে যাই। তাসাদ্দক ও তার পিতাকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বললাম ব্যাপার কী? কী হয়েছে? বলা হল উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিসে সেমিনারকে কেন্দ্র করে জরুরী সভা হচ্ছে। সেখানে জাব্বার সাহেব ও সালাম সাহেব উপস্থিত আছেন। সকলকে দোয়ার অনুরোধ করা হল। রাত বারোটায় জাব্বার সাহেব ও সালাম সাহেব এসে বললো, সভায় উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে ইউ.এন.ও.-এর মধ্যে কঠিন বাক-বিতণ্ডা হয়। তিনি বলেন আয়োজকরা প্রশাসনের যথাযথ অনুমতি সাপেক্ষেই সেমিনার আয়োজন করছে ও সকল প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ করেছে এবং সবাই সকালে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবে। আপনি এত সব প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া এক মাদরাসার অন্যায় দাবীর মুখে প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিবেন, এটা সমীচীন হবে না। আপনি মাদরাসা নিয়ে থাকুন, আমরা নেই আপনার সাথে। সবশেষে সিদ্ধান্ত হয়, সেমিনার শান্তিপূর্ণভাবে হতে দিতে হবে, বরং আপনি মাদরাসার লোকদের বলুন, তারা যেন কোন প্রকার হট্টগোল না করে। শেষ পর্যন্ত এটাই ঠিক হয়। এরপর আমাদের উদ্বিগ্নতা প্রশমন হয়। আর রাত ১টার পর আমরা ঘুমোবার সুযোগ পাই। রাতে তাহাজ্জুদেও অনেক দোয়া করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে ১ মে ১৯৮৬, সকাল ১০ ঘটিকায় সরিষাবাড়ী উপজেলা মিলনায়তনে নির্ধারিত সেমিনার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীসহ তাদের অবিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। মূল বিষয়ের ওপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও জনাব মুস্তাফা আলী সাহেবও বক্তব্য রাখেন। অতপর শ্রোতা মণ্ডলীর নিকট থেকে প্রশ্ন আহবান করা হয়। ২৯ জনের নিকট থেকে ৪০টি প্রশ্ন আসে। সেমিনার দুপুর ১ টার মধ্যে সমাপ্তের কথা থাকলেও মনোজ্ঞ প্রশ্নোওর আলোচনার প্রতি অধীর আগ্রহ থাকায় বেলা আড়াইটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রধান অতিথি মওলানা নূরুল ইসলাম সাহেব কর্তৃক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ১৫০ জনের আয়োজনের কথা থাকলেও ২৫ আহমদীসহ উপস্থিত ছিল প্রায় ২০০ জন। উল্লেখ্য, প্রধান অতিথি সাহেব মাদরাসার পক্ষে থাকলেও ইউ.এন.ও. মিষ্টার বি. কে. দেবনাথ বাবুর বিশেষ ভূমিকার কারণে বিরোধিতা তো দূরের কথা উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য হন।... *(চলবে)*

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا وَّنِسَآءً ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَالۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا ﴿۲﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ﴿۷۱﴾ۙ
يُّصۡلِحۡ لَكُمۡ اَعۡمَالَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ ؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا ﴿۷۲﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে নিশ্চয়ই অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلۡتَنۡظُرۡ نَفۡسٌ مَّا قَدَّمَتۡ
لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۹﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

আয়েলি মাসায়েল অওর উনকা হাল্

(পারিবারিক সমস্যাবলী ও এর সমাধান)

পূর্ব প্রকাশের পর

পুরুষ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক

পুরুষদের 'কাওয়াম' তথা অভিভাবক হওয়া সংক্রান্ত পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ব্যাখ্যায় হুযূর (আই.) বলেন–

"বর্তমানকালে ছোটখাটো বিষয়ে নারীদের ওপর হাত তোলা হয়, অথচ নারীকে যেখানে শাস্তি দেয়ার অনুমতি রয়েছে সেখানে অনেকগুলো শর্ত নির্ধারিত আছে, মনগড়া অনুমতি নয়। কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি আছে। যে অবস্থায় উপনীত হলে এই শাস্তি প্রযোজ্য হয় কোন আহমদী মহিলা বিরলই এতটা অধপতিত হবে, যার এ শাস্তি হতে পারে। কাজেই ছুতো না খুঁজে পুরুষের উচিত নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান

করা, যেভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۔
فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۔
وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۔ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ۔

অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, সেই শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের ওপর প্রদান করেছেন আর একারণেও যে তারা তাদের সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করে (যেসব অকর্মন্য ব্যক্তি ঘরে বসে থাকে তারা তো এমনিতেই অভিভাবক হয় না)। অতএব পুণ্যবতী নারী হলো (তারা, যারা) আনুগত্যশীলা এবং (স্বামীর) অগোচরেও সেসব জিনিসের সুরক্ষাকারী যেগুলোর সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্ তাগিদ করেছেন। আর যেসব নারীর পক্ষ থেকে তোমরা বিদ্রোহসূলভ আচরণের আশঙ্কা কর তাদেরকে প্র মে উপদেশ দাও (এতে নির্লজ্জতা অন্তর্ভুক্ত নয় বরং এমন বিষয়াদি যা প্রতিবেশীর মাঝে কোন দুর্নামের কারণ হচ্ছে সেসবের কথা বলা হচ্ছে।) অতএব প্রথমে তাদেরকে উপদেশ দাও, এরপর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও আরএরপরও যদি প্রয়োজন পড়ে তবে তাদেরকে শারীরিক শাস্তিও দাও। এরপর বলেছেন, কিন্তু তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অজুহাত বা ছুতো খুঁজে বেড়িও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিব উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মহা গৌরবান্বিত।

(সূরা আন নিসা: ৩৫)

অতএব বলা হয়েছে, এই চরম বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে স্ত্রী যদি নিজের সংশোধন করে নেয়, তাহলে অযথা তাকে শাস্তি দেয়ার অজুহাত খুঁজবে না। স্মরণ রেখো! তোমরা যদি তাকওয়া বর্জিত মানুষের মত এমন আচরণ কর এবং নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে কর আর তোমাদের নিকট স্ত্রীর কোন মূল্যই না থাকে তবে মনে রেখো আল্লাহ্ তা'লার সত্তাও এমন পরাক্রমশালী যে, তোমাদের এমন আচরণের জন্য তোমাদেরকেও পাকড়াও করতে পারেন। অতএব শাস্তি দেয়ার জন্য যে স্তরগুলো বা শর্তগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে তা মেনে চল। যদি সংশোধনের কোন উপায় খুঁজে না পাও আর স্বভাবগতভাবেই এমন মহিলা এক ও অভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করেই চলে, কেবল তবেই শাস্তি দেয়ার নির্দেশ রয়েছে; কথায় কথায় হাত উঠাবে বা বেত্রাঘাত করবে– এর অনুমতি নেই। আর এত বড় অত্যাচারী হয়ো না যে, ছুতো খুঁজে এক ভদ্র মহিলাকে বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ প্রদর্শনকারীদের গণ্ডিভুক্ত করবে এবং শাস্তি দেবে।

এমন পুরুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ জামা'তী ব্যবস্থাপনার নিকট যদি এমন সংবাদ পৌঁছে তবে এমন লোককে (জামা'ত) অবশ্যই শাস্তি দিয়ে থাকে। খোদার দোহাই লাগে, পবিত্র কুরআনের দুর্নাম করবেন না আর নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন।"*(জুমুআর খুতবা, ২ জুলাই ২০০৪, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, মিসিসাগা, কানাডা)*

এ প্রসঙ্গে হুযূর আনোয়ার (আই.) আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-

"হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) মলফুযাতে বলেন, আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াতদাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার আচারব্যবহার ভালো নয় এবং সুন্দরভাবে জীবন কাটায় না, সে আবার পুণ্যবান কীভাবে হলো? অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার তখন হওয়া সম্ভব যখন সে নিজের স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করবে। যেসব মানুষ বাহ্যতঃ পুণ্যবান মনে হয়ে থাকে তাদের মাঝেও অনেক ভুলত্রুটি থাকে। যারা স্ত্রীদের সাথে বা পরিবারের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না, সমাজের মানুষেরও উচিত এমন লোকদের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং বাহ্যিকতায় মুগ্ধ না হওয়া।

তিনি (আ.) বলেছেন, তাকে স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং উত্তমভাবে জীবনযাপন করতে হবে। এমন নয় যে প্রতিটি তুচ্ছ বিষয়েই হাত উঠাবে। এমন ঘটনাও ঘটে যে, অনেক সময় রাগী স্বভাবের মানুষ স্ত্রীর সাথে অতি সামান্য বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রহার করে এবং স্পর্শকাতর কোন স্থানে আঘাত করে বসে আর স্ত্রী মারা যায়। একারণে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *(সূরা আন নিসা: ২০)*। হ্যাঁ সে যদি অপকর্ম করে তবে সতর্ক করা আবশ্যক।" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩-৪০৪)*

অনেক সময় বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছোট ছোট বিষয়ে তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়, তিক্ততা হয়েই যায়। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষকে বেশি দৃঢ় ও শক্তিশালী বানিয়েছেন। পুরুষ যদি নিরব থাকে তবে হয়তো শতকরা আশি ভাগেরও বেশি বিবাদ সেখানেই মিটে যায়। শুধু মাথায় রাখা দরকার যে, আমাকে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

এ বিষয়ে আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) আমাদেরকে কী আদর্শ দেখিয়েছেন। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) একদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে কিছুটা তীর্যকভাবে ও কর্কশতার সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে আসেন আর এ অবস্থা দেখে তিনি সইতে না পেরে নিজের মেয়েকে তিনি মারতে উদ্যত হয়ে বললেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সাথে এভাবে কথা বলছো! এটি দেখে মহানবী (সা.) বাপ-বেটির মাঝে এসে দাঁড়ালেন আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে রক্ষা করলেন। হযরত আবু

বকর (রা.) চলে যাওয়ার পর রসূলে করীম (সা.) রসিকতা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, দেখেছো! আমি তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে কীভাবে বাঁচালাম?

অতএব দেখুন, এটি কত মহান আদর্শ! কেবল নিরব থেকে ঝগড়া মিটানোরই চেষ্টা করেন নি বরং হযরত আয়েশার পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-কেও বলেছেন, আয়েশাকে কিছু বলবেন না আর তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আয়েশার সাথে রসিকতা করে সাময়িক মানসিক চাপও দূর করে দিয়েছেন। এরপর হাদীসে রয়েছে যে, কিছুদিন পর হযরত আবু বকর (রা.) যখন পুনরায় আসেন তখন মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) হেসে হেসে প্রফুল্লতার সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, দেখো! তোমরা তোমাদের বিবাদে আমাকে জড়িয়েছিলে, এখন তোমাদের আনন্দেও আমাকে শামিল কর। *(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব মাজা ফিল মাযাহে)*

মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর খুনসুটি সহ্য করতেন। একবার তাকে বলেন, হে আয়েশা! তুমি অসন্তুষ্ট নাকি আনন্দিত তা আমি ভালোভাবে বুঝি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তা কীভাবে? তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক তখন তোমার কথাবার্তার সময় তুমি রাব্বে মুহাম্মদ (সা.) বা মুহাম্মদের প্রভু বলে কসম খেয়ে থাক আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন তুমি রাব্বে ইব্রাহীম (আ.) বা ইব্রাহীমের প্রভুর নামে (কসম খেয়ে) কথা বল। (এ কথা শুনে) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি ঠিক বলেছেন, তবে আমি তো কেবল মুখেই আপনার নাম নেয়া বন্ধ করি (কিন্তু হৃদয় থেকে তো আপনার ভালোবাসা তিরোহিত হতে পারে না)। *(বুখারী কিতাবুন নিকাহ, বাব গায়রাতুন নিসা ওয়া ওজদু হিন্না)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকি সকল বক্রতা ও তিক্ত কথাবার্তা সহ্য করা উচিত। তিনি আরো বলেন, পুরুষ হয়ে নারীর সাথে বিবাদ করাটা আমার কাছে চরম নির্লজ্জতা মনে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন, সত্যিকার অর্থে এটি আমাদের প্রতি নেয়ামতের পূর্ণতা। এর কৃতজ্ঞতা হলো আমরা যেন মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করি।"

একবার এক বন্ধুর কঠোর স্বভাব ও অশালীন ভাষার উল্লেখ হয় এবং অভিযোগ উঠে যে, তিনি স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণ করেন। এ কথা শুনে হুযূর (আ.) খুবই মর্মাহত, দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "আমাদের বন্ধুদের এমন হওয়া উচিত নয়।" (এরপর) হুযূর (আ.) অনেকক্ষণ যাবৎ স্ত্রীদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন কাটানো সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সবশেষে বলেন, "আমার অবস্থা দেখুন! একবার আমি আমার স্ত্রীর সাথে (কিছুটা) উচ্চস্বরে কথা বলেছিলাম আর আমার মনে হয়েছিল, সেই উঁচু স্বরের সাথে মনোকষ্টের মিশ্রণ ছিল, যদিও মর্মপীড়াদায়ক ও কঠোর কোন শব্দ মুখ থেকে বের হয় নি। তবুও আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত এস্তেগফারে রত থাকি এবং খুবই বিগলিত চিত্তে কাকুতি-মিনতি করে নফল নামায পড়ি এবং কিছু সদকাও দেই। কেননা স্ত্রীর প্রতি এমন কঠোরতা; তা হতে পারে আল্লাহ্‌র প্রতি কোন অজানা অবাধ্যতারই ফলাফল।" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭, রাবওয়াতে মুদ্রিত)*

অতএব এই হলো স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যা এযুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মের মাঝে তার মনিব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর অনুসরণে আমরা দেখতে পাই। এসবের অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা আমাদের ঘরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।" *(জুমুআর খুতবা, ২৩ জানুয়ারি ২০০৪; খুতবাতে মসরূর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৫, মুদ্রণ, নাযারাতে ইশায়াত, রাবওয়া, সংস্করণ ২০০৫)*

২০০৫ সনের ২৪ জুন, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার টরেন্টো, কানাডায় হুযূর আনোয়ার (আই.) তার জুমুআর খুতবায় পুরুষদেরকে নারীদের সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে বলেন–

"পুরুষকে আল্লাহ্ তা'লা অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন, কারণ তার মাঝে সহ্যক্ষমতা বেশি থাকে। তার স্নায়ু অনেক বেশি মজবুত হয়ে থাকে। তাই ছোটখাটো ভুলত্রুটি হয়ে গেলেও তাদেরকে (অর্থাৎ নারীদেরকে) ক্ষমা করে দেয়া উচিত।" *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ জুলাই ২০০৫)*... *(চলবে)*

(আয়েলি মাসায়েল আওর উনকা হাল, পৃ. ৪৫-৫০)

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক- নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"আল্লাহ্ তোমাকে আশীষের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অঢেল আশীষ বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন" (আমীন)। *(আবু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)*

- গত ০১/০১/২০২১ সিমু আক্তার, পিতা: রহমত আলী রতন, গ্রাম: আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে ঈশান আহমদ, পিতা: এহ্‌শানুল হক, তারুয়া মধ্যপাড়া, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিবাহ ২,৮০,০০০/- (দুইলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৪৫

- গত ১৫/০১/২০২১ লিজা আক্তার, পিতা: লোকমান লস্কর, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ৩৪০০-এর সাথে আসিফ আহমদ, পিতা: ইউসুফ আহমদ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৪৮

- গত ১৪/০২/২০২১ রাজিয়া সুলতানা (সেতু), পিতা: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পশ্চিম নন্দিপাড়া, খিলগাঁও, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিতা: মোহাম্মদ ইদ্রিস হাওলাদার, সোনাখালী, আমতলী, বরগুনা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৪৬

- গত ২৫/০১/২০২১ জান্নাতুল ফেরদৌস মৌ, পিতা: মোর্শেদুল ইসলাম, ৪৪৫, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে মোহাম্মদ সমশের আলী, পিতা: মোহাম্মদ আরমান আলী সরকার, রোড নং-১, বাড়ী নং-১৯০, তালতলা নন্দীপাড়, দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০-এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৪৯

- গত ১৪/০৮/২০২০ মহিমা-ই-ইলাহী, পিতা: তৌফিক-ই-ইলাহী, গ্রাম: দূর্গারামপুর, পো: বীরগাঁও, থানা: নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে সাব্বির আহমদ, পিতা: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৪৭

- গত ১২/০২/২০২১ নাজমুন নাহার শুচি, পিতা: নাসের আহমদ বাবু, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ বাশার তুল্লাহ, পিতা: মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ, ১নং কে, বি, ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর: ১৭৫০

সংবাদ

ফাজিলপুর জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন

গত ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নুর এলাহী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর আহমদ উল্লাস। নযম পরিবেশন করেন মোছাঃ জেবিন আক্তার। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ২৩ মার্চ সম্পর্কে বিস্তারতি আলোচনা করেন জনাব রুমেল আহমদ (মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ)। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব রেজোয়ানুল হক খান। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত দিবসে ১ জন মেহমানসহ ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

রুমেল আহমদ, মোয়াল্লেম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুর

তাহেরাবাদ জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যান করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন লাজনা বোন মোসা: রেজওয়ানা বেগম। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন ছোট নাসেরাত মোসা: নাসিরা সোহেল। অতঃপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাক মাহমুদ কিরন, জনাব মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, মওলানা মোহম্মদ রশিদ আহমদ, জনাব মোহাম্মদ জিন্নাত আলী প্রামানিক, মোহাম্মদ আবদুল খালেক মোল্লা এবং মোহাম্মদ ইউনুস আলী প্রামানিক। তারপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন নাসেরাত মোসাম্মৎ সাবানুর। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তাহেরাবাদ

সোহাগী জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন

মহান আল্লাহ্ তা'লার ফযলে গত ২৩ মার্চ ২০২১ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ডা. হান্নান সাহেবের সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোহাগীর উদ্যোগে মহান মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তিলায়াত করেন জনাব হলুদ মিয়া। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরবী কাসিদা পাঠ করেন লাজনা গ্রুপ। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের গুরুত্ব ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব– ফজলুল হক, মঞ্জরুল হক এবং এস এম মাহমুদুল হক (মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ)। সবশেষে সভাপতির ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে ৩৭ জন আহমদী সদস্য এবং সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস এম মাহমুদুল হক, মোয়ালেম ওয়াকফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোহাগী

হেলেঞ্চাকুড়িতে ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া, হেলেঞ্চাকুড়ি ওয়াকারে আমল বিভাগের উদ্যোগে দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় নিয়ে জামা'তের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরী বাঁশের সাঁকোতে কচুরিপানা দেওয়া হয়। বর্তমানে নদীর পানি না থাকায় সাঁকোর পাশ দিয়েই মানুষ চলাচল করে। আর প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে বাঁশগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেই জন্যই এই কচুরিপানা দেওয়া হয়।

আতিকুর রহমান, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, হেলেঞ্চাকুড়ি

আহমদীয়াতের অন্তরিক্ষ থেকে এক পুণ্যাত্মার প্রয়াণ

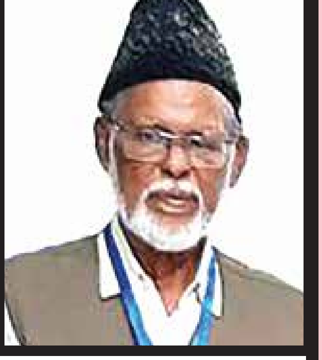

তিনি আর কেউ নন, আমাদের সর্বজন প্রিয় আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী। ১৯৩৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা অন্তর্গত সরাইল উপজেলা সদরে তাঁর জন্ম। জনাব আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের সম্মানিত পিতার নাম মীর উসমান আলী এবং মাতার নাম সৈয়্যদা আমাতুর রহমান। তাঁর দাদা জনাব মীর সেকান্দার আলী এবং দাদী জুবেদা খাতুন। সরাইলেই তাঁর দূরন্ত শৈশব কাটে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামে চলে যান এবং সেখান থেকে ১৯৫৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। নাটোরের অধিবাসী জনাব আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা জনাবা মরিয়মের সাথে ১৯৬৩ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৬৩ সাল থেকে ঢাকা জামা'তের গুলশান-মহাখালী হালকার মুহাচ্ছিল ও জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা জামা'তের সেক্রেটারী ওয়াফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর বাংলাদেশ জামা'তের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরিকে জাদীদ ও পরে সেক্রেটারী তবলীগের দায়িত্ব পালন করারও সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯৯৭ সালের ৩১ মে থেকে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ন্যাশনাল আমীর থাকাকালে ফতুল্লা নতুন জামা'তে উন্নীত হয় এবং বাংলদেশে জামেয়া আহমদীয়ার পথ চলা শুরু হয়। এছাড়া দারুত তবলীগ মসজিদের তৃতীয় তলায় টিন সেড স্থাপনের মাধ্যমে জায়গা সম্প্রসারণ করা হয়। দরিদ্র বিমোচনের জন্য তিনি সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ন্যাশনাল আমীর থাকা অবস্থায় ঢাকা দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিকে ৬ তলা ভবন নির্মিত হয়।

২০১৩ সালে তিনি ঢাকা জামা'তের আমীর নিযুক্ত হয়ে আমৃত্যু এ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। এসময়ে তিনি মাদারটেকে পাঁচ তলা মসজিদের ৩য় তলা পর্যন্ত এবং মিনারাতুল মসীহ্ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করেন। পাশাপাশি আশকোনা মসজিদ বর্ধিতকরণ ও নাখালপাড়া মসজিদ পুনঃনির্মাণের কাজে হাত দেন। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হাতে নেন যা আগামীতে বাস্তবায়ন হবে, ইনশাআল্লাহ্।

গত ১২ এপ্রিল ২০২১, সোমবার বেলা ১১:৫৫ মিনিটে ঢাকা জামা'তের আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব পরকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অসুস্থ্য স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই পুত্র এবং নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এ নিবেদিত প্রাণ আহমদীকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকামে স্থান দিন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তাঁর পুণ্যকর্মসমূহ বহাল রাখার সৌভাগ্য দিন।

জানাযায় আগত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মরহুমের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করে নামাযের ইমামতি করেন

New Vol. No. 83 | 19th Issue

The Ahmadi Fortnightly Since 1922

15th April, 2021 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. (Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200
২. Chelidonium Q (Mother tincture)

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ماَ خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُکَ رَبِّ فَاحْفَظْنِیْ وَانْصُرْنِیْ وَارْحَمْنِیْ

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)